

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা নওরীন হাফসা

রোলঃ 23090121001

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা নওরীন হাফসা

রোলঃ 23090121001

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা নওরীন হাফসা, আইডিঃ 23090121001 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাবরিনা নওরীন হাফসা

আইডিঃ 23090121001

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
সেকুলার তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিবিভাগ	12
একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা	31
উপযুক্ততার প্রশ্ন	32
ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদীদের কাছ থেকে.....	33
রক্ষণশীল মুসলিমদের কাছ থেকে	34
কর্তৃত্ববাদের সাথে সংযোগের প্রশ্ন	35
ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদ	36
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ.....	37
রাষ্ট্র অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন.....	38
বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা	47
আমাদের শিক্ষা কমিশন	55
শরিয়তে ধর্মের স্বাধীনতা: মাত্রা এবং মানদণ্ড.....	62
ড. রেদওয়ান মাসমোদীর ভূমিকা	76
রশিদ ঘানুশীর বক্তব্য.....	78
যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকা	79
ইউরোপে ধর্মের ভূমিকা	80
ইসলাম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা.....	80
ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির প্রসঙ্গ	81
ধর্মের প্রকৃত ভূমিকা	82
ইসলামে বহুত্ববাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার ধারণা.....	83
আমাদের চ্যালেঞ্জ.....	84
রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক	85

বিশ্বাসের স্বাধীনতা.....	87
শেষ কথা.....	88
তৎকালীন ইউরোপের অবস্থা.....	92
ধর্ম ও বিজ্ঞানের লড়াই.....	93

আল্লাহর নামে, পরম করুণাময়, বিশেষ করুণাময় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক, আমাদের নবী মুহাম্মদ, শেষ নবী, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল সাহাবীদের উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ভূমিকা

যে মতবাদটিকে ইংরেজিতে secularism বলা হয় তার আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে বহুলভাবে علماني [‘আলমানি] শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর বাংলায় এর (সত্যের অপলাপকৃত) অনুবাদ করা হয় ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ শব্দ দিয়ে। তাহলে দেখা যাক সে সেকুলারিজম (বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) কী? ছোট্ট একটি প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তর চাই স্পষ্ট, নিখুঁত ও বিস্তারিত। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রত্যেক মুসলিমের জানা-থাকা জরুরি। আল্লাহর মেহেরবানী যে, এ পর্যন্ত সেকুলারিজমের উপর বহু গ্রন্থ লিখা হয়েছে, আমাদের কর্তব্য শুধু জানা ও আমল করা।

এবার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করি, তবে এ জন্য আমাদের বেশী কষ্ট করতে হবে না, কারণ যেখানে ‘সেকুলারিজম’ বা তথাকথিত ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ মতবাদের জন্ম, সে পাশ্চাত্য দেশসমূহে লিখিত অভিধানগুলো আমাদেরকে সেটার অর্থ খোজা ও সন্ধান করার কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে:

১. পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী।
২. ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়।
৩. দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়[1]।

একই অভিধানে secularism শব্দের সংজ্ঞায় এসেছে:

“secularism এমন একটি দর্শন, যার বক্তব্য হচ্ছে, চরিত্র-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না”।

‘ব্রিটিশ বিশ্বকোষ’-এ আমরা দেখি, সেখানে সেকুলারিজম সম্পর্কে বলা হয়েছে: “সেকুলারিজম একটি সামাজিক আন্দোলন, যার একমাত্র লক্ষ্য মানুষদেরকে পরকালমুখী থেকে ফিরিয়ে এনে দুনিয়ামুখী করা”।

Encyclopedia Britanica নামীয় ব্রিটিশ বিশ্বকোষে Atheism বা ‘নাস্তিকতা’ শিরোনামের অধীন secularism এর আলোচনা এসেছে। তাতে Atheism তথা নাস্তিকতাকে দু’ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাত্ত্বিক নাস্তিকতা (الحد نظري)

২. ব্যবহারিক নাস্তিকতা (الإلحاد عملي)।

‘বিশ্বকোষ’ সেকুলারিজমকে দ্বিতীয় প্রকার নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আলোচনা থেকে দু’টি বিষয় স্পষ্ট হল:

এক. সেকুলারিজম একটি কুফরি দর্শন, তার একমাত্র লক্ষ্য দুনিয়াকে দ্বীনের প্রভাব মুক্ত করা। সেকুলারিজম একটি মতবাদ, তার কাজ হচ্ছে পার্থিব জগতের সকল বিষয়কে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার নিজের তৈরি বিধান দেওয়া ও সকল স্তরে নেতৃত্ব প্রদান করা।

দুই. সেকুলারিজমের সাথে জ্ঞান বা বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন কতক কুচক্রী মানুষদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য বলে, সেকুলারিজম অর্থ ‘ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ ও তার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা’। এ বক্তব্যের অসারতা ও সত্য গোপন করার অপকৌশল আমাদের বর্ণিত অর্থ থেকে স্পষ্ট, যা আমরা গ্রহণ করেছি ‘সেকুলারিজম’ এর সুতিকাগার থেকে, যে সমাজে তার জন্ম ও পরিচর্যা হয়েছে। তাই ‘সেকুলারিজম’ এর অর্থ যদি করা হয় ধর্মহীনতা, তাহলে তার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে এবং তাতে অপলাপের কিছু থাকবে না, বরং যথার্থ অর্থই স্পষ্ট হবে।

[1] ‘দুনিয়াবিমুখিতা’ বা ‘সংসারবিরাগী’ খৃস্ট ধর্মে একটি ইবাদতগত বিষয়। খৃস্টানগণ এ বিদ‘আতটি আবিষ্কার করেছে। সুতরাং যখন তারা বলে, সেকুলার অর্থ, ‘সংসারবিরাগী নয়’ তখন তারা এর দ্বারা অর্থ নেয় যে, সে ইবাদতকারী নয়। মুসলিমরা মনে করে যে সংসারবিরাগী হওয়া বিদ‘আত। কিন্তু খৃস্টানরা এটাকে বিদ‘আত মনে করে না। তারা এটাকে তাদের সত্যিকার দ্বীন মনে করে। সুতরাং যখন কেউ বলবে যে, অমুক সংসারবিরাগী নয় তখন সে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয় যে, লোকটি ইবাদতের ধার-ধারে না। ‘বিদ‘আত করে না’ এ অর্থ উদ্দেশ্য নেয় না।

[2] নাস্তিকতার উপর আভিধানিক বিশ্লেষণ ড. মুহাম্মদ যায়ন আল-হাদি রচিতنشأة العلمانية বা ‘সেকুলারিজম এর উৎপত্তি’ গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

‘সেকুলারিজম’ এর আত্মপ্রকাশ

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজ একসময় ধর্মীয় দোদুল্যতায় ভূগছিল, যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উর্বর ভূমি ও অনুকূল পরিবেশ, তখন সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নামক বিষবৃক্ষটি জন্ম নেয় ও বেড়ে উঠে। ফ্রান্সে ঘটে যাওয়া প্রসিদ্ধ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম ফ্রান্সই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো দাঁড় করায়। এ মতবাদটি যদিও তার অভ্যন্তরে নাস্তিকতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে দূরে সরিয়ে রাখা, এমনকি দ্বীনের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষ ও দ্বীন বিরোধিতা ইত্যাদি মারাত্মক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড লালন করত, তারপরও তখনকার

সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আত্মপ্রকাশ ও তার অনুশীলন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অদ্ভুত ছিল না, কারণ;

প্রথমত: সে-সময় তাদের ঈসায়ী দ্বীন আল্লাহর নিখাদ ওহী ভিত্তিক ছিল না, যা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসা ইবনে মারয়াম ‘আলাইহিস সালামের নিকট প্রেরণ করেছেন, বরং তাতে বিকৃতি ও মিথ্যার হাত অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই তাদের দ্বীন ছিল বিকৃত, পরিবর্তিত, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত, যা মানব কল্যাণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথেও তা ছিল সাংঘর্ষিক। সে-সময় ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দানকারী গির্জাগুলো তাদের সন্ন্যাসী ও সংসারবিরাগীদের বিকৃতি ও পরিবর্তনকে শুধু সমর্থন নয়, দ্বীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা পালন করা ও যার উপর অটল থাকা তখন প্রত্যেকের উপর ফরয ছিল। বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের বিরুদ্ধে গির্জায় অভিযোগ করা হয়, ফলে গির্জা তাদেরকে শাস্তি দেয়, কারণ তারা বিকৃত দ্বীনের বিপরীত আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে যিন্দিক ও নাস্তিক বলে অপবাদ দেয়, অতঃপর তাদের অনেককে করা হয়েছে হত্যা, আবার অনেককে দেওয়া হয়েছে জ্বালিয়ে এবং তাদের বহুসংখ্যককে করা হয়েছে জেলে বন্দি।

দ্বিতীয়ত- খৃস্টানদের ধর্মীয় মুখপাত্র- গির্জাগুলো অত্যাচারী বাদশাহদের সাথে অনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাদেরকে পবিত্র ও নিষ্পাপ সত্ত্বা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা প্রজাদের উপর যে জুলম ও অত্যাচার করত, গির্জাগুলো সেগুলোর বৈধতা প্রদান করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এটাই প্রকৃত ধর্ম, যার শরণাপন্ন হওয়া ও যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সবার জন্য জরুরি। তাই মানুষ গির্জার জেলখানা ও তার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে। তখন খৃস্টীয় দ্বীন থেকে বের হওয়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, জীবন-ঘনিষ্ঠ সকল বিষয় যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও আদর্শ ইত্যাদি থেকে তাকে দূরে রাখা, বরং বিতাড়িত করা ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় ছিল না, কারণ তা জালেমদের পক্ষাবলম্বন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

হায়! তাদের জন্য কতই না ভালো হত, যদি তারা সেই বিকৃত খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু তারা সে বিকৃত খৃস্টান ধর্মের উপর বিরক্ত হয়ে সকল দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজে এ জাতীয় ঘটনার আত্মপ্রকাশ আশ্চর্য কোনো বিষয় নয়, তবে ইসলামে তার কোনো সুযোগ নেই, বরং কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ওহী, যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এ দ্বীন বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত, তাতে কোনো বিষয় বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা সম্ভব নয়, সে কাউকে পরোয়া করে না, হোক সে রাজা কিংবা প্রজা। সবাই তার শরীয়তের সামনে সমান।

এ দ্বীন মানুষের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষণকারী, এতে একটি বিধান নেই যা তাদের স্বার্থ পরিপন্থী। এ দ্বীন (ইসলাম) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করে। এতে প্রমাণিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব দ্বীনে ইসলাম পুরোটাই সত্য, পুরো দ্বীনই কল্যাণ, পুরো দ্বীনই ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ থেকে আমরা বলতে পারি, পাশ্চাত্য সমাজে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ ও অনীহা থেকে যে চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী দেশে কখনো তা প্রকাশ পেত না, বরং মুসলিম দেশের কেউ তা শ্রবণও করত না, যদি না থাকত সংঘবদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ, যা ইসলামের নিক্রিয় ও নিষ্প্রভ হালতে ঈমান-শূন্য কতক অন্তর ও সুস্থ চিন্তা-শূন্য কিছু বিবেককে শিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানরাও বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদ আমদানি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কম-যায়নি, তাদেরও রয়েছে বড় ভূমিকা ও ক্ষতিকর প্রভাব। অনুরূপ সেকুলারিজম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষানবিশরাও ভূমিকা রেখেছে প্রচুর, যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে গিয়েছিল। সেখানে তারা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও তার আবিষ্কার দেখে ফেতনায় পতিত হয়, অতঃপর সে সকল দেশের প্রচলিত প্রথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আচার-আচরণ বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে আসে। অতঃপর এক শ্রেণির লোক সে সব (বিদেশ ফেরৎ তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী) লোকদের পেশ করা এ সব তথ্য ও নীতিগুলো গ্রহণযোগ্য হিসেবে লুফে নেয়, তাদের ধারণা এরাই উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত এসব বিদেশ ফেরৎ লোকদের দেখা অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি যেগুলো তারা খুব বড় ও মহত চিন্তাধারা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তা এমন সমাজের-যার সাথে দ্বীনের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের আইনে "ধর্মের নিরপেক্ষতা" (বাংলা : ধর্মনিরপেক্ষতা) নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশী আইনের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪ ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতির একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে পারলাম, যা আমাদেরকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে:

এক. মুসলিম দেশে বাসকারী খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আল্লাহ তাদেরকে যে স্থানে রাখতে বলেছেন আমরা তাদেরকে সেখানেই রাখব।

তাদেরকে মুসলিম দেশে সামান্যতম কর্তৃত্ব ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেব না। সকল মিডিয়া, প্রচারযন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলোর দরজা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করে রাখব না, বরং বন্ধ করে রাখব, যেন তারা মুসলিমদের মাঝে তাদের বিষ ছড়ানোর সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কাজ করবে কে! অধিকন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান সেকুলারিজমের বিষ ছড়ানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন পদ ও পদবী দিয়ে রেখেছে! আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

দুই. শিক্ষানবিশদের বহির্বিপ্লবে পাঠানোর ঝুঁকিও অনেক। তার পরিণতি ভয়াবহ। অনেক মুসলিম সন্তান এমন চেহারা ও অন্তর নিয়ে সেখানে থেকে এসেছে যা নিয়ে সে সেখানে যায়নি। অতএব বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সেখানে যাওয়া যখন ঝুঁকিপূর্ণ, তখন দ্বীনি ইলম শিখার জন্য সেখানে যাওয়া কিভাবে নিরাপদ, বিশেষ করে আরবি কিংবা ইসলামী বিষয়াদি শেখার জন্য? আরবি কি আমাদের মুসলিমদের ভাষা, নাকি তাদের ভাষা? কুরআনুল কারিম নাযিল হয়েছে আমাদের ভাষায়, না তাদের ভাষায়?[1]!

এটা কি কখনো সম্ভব বা যুক্তি সঙ্গত যে, একজন মুসলিম ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও শরীয়তের বিদ্যার্জন করবে এমন লোকদের থেকে, যারা কউর কাফের, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পোষণকারী?!

>

[1] লেখক আরবি ভাষাভাষি, তার দেশের অনেক ছাত্র আরবি ভাষা শেখা ও তার উপর ডক্টরেট হাসিল করার জন্য অমুসলিম দেশে যায়, তাদের নিরুৎসাহিত করে তিনি এ কথা বলছেন। লেখকের সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনে ইসলাম শেখার জন্য সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে সাবধান করতে পারি।

সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) এর বিবিধ রূপ

সেকুলারিজমের দু'টি রূপ রয়েছে। যার একটি অপরটি থেকে জঘন্য:

প্রথম রূপ: সরাসরি নাস্তিকতা: এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা

ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, অথবা জেল দেওয়া অথবা হত্যা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়।

দ্বিতীয় রূপ: পরোক্ষ নাস্তিকতা[1]:

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে।[2] দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এ প্রকার সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিত থাকে, কেউ তাদের কাফের ও দ্বীন থেকে খারিজ বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রকাশ্য নাস্তিকতাসহ আত্মপ্রকাশ করেনি। তাদের কাফের না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। মুসলিম উম্মতকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, তারা যেন এসব সংস্থা ও সংগঠন থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো মুসলিম সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের কথা বা লেখনীতে আল্লাহর নাম অথবা রাসূলের নাম অথবা ইসলামের নাম শুনে বা দেখে আশ্চর্য হয় না[3], বরং তারাই আশ্চর্য হয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

মোদাকথা:

উভয় প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) স্পষ্ট কুফরি, এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মনেপ্রাণে মেনে নেয়, সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। কারণ, ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে, হোক তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক বা সামাজিক কোনো শাখা। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না।

ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ (البقرة: ২০৮)]

“হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর” [4]

কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা‘আলা কাফের বলেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে:

أَفْتَوْمُنُونَ بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرة: ৮০)]

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন” [5]

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের [6]

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই” [7]

[1] আমরা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দু’ভাগে ভাগ করেছি, কারণ সাধারণ লোকেরা নাস্তিকতা বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করাকেই বুঝায়, অথচ সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাও এক প্রকার নাস্তিকতা, বরং নাস্তিকতার একটি শাখা হচ্ছে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

[2] দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতা বা সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) সংঘর্ষ অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়, কারণ তাদের নিকট দ্বীন হচ্ছে ধর্মীয় কয়েকটি ইবাদতের নাম। তাই এ পরোক্ষ সেকুলারিজম (পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা) যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় ও বায়তুল্লাহ শরীফের হজকে নিষেধ করে না, তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দীন বিরোধী নয়। কিন্তু দীনকে যারা সঠিকভাবে বুঝেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরীয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলাম বিরোধী কোনো মতবাদ কি আছে? যদি তারা তা বুঝে!

[3] কারণ তারা ভালো করেই জানে যে এরা এগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। [সম্পাদক]

[4] সূরা বাকারা: (২০৮)

[5] সূরা বাকারা: (৮৫)

[6] দেখুন: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. রচিত نواقض الإسلام গ্রন্থের ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকার। আরো দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (২৭) নং পৃষ্ঠা।

[7] দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (২৭) নং পৃষ্ঠা।

সেকুলার তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের শ্রেণিবিভাগ

সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীরা আরব ও ইসলামী বিশ্বে সংখ্যায় অগণিত, আল্লাহ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না করুন, তাদের অনেকে লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক; কাউকে বলা হয় চিন্তাবিদ, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের বিরাট এক সংখ্যা

বিভিন্ন মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে কর্মরত ও কর্তৃত্বকারী, এ ছাড়া অন্যান্য পেশায়ও তাদের সংখ্যা কম নয়।

এসব পেশায় নিয়োজিত তারা সবাই একে অপরের সহযোগী, সবাই মিলে সেকুলার (বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা যা সত্যিকার অর্থে ধর্মহীনতা সে) মতবাদ প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে, যে কারণে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা আজ মানুষের জীবনের অধিকাংশ শাখায় বিস্তার লাভ করেছে। আল্লাহর নিকট মুক্তি ও নিরাপত্তা চাই।

আরব ও ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দাঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লাস্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহুদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহুদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে যেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যিকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিশালী কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে

বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: “মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না”। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্যে জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: “রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে”।

আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্থায়ী শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্যে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

মুসলিমদের দ্বীন বিকৃত করার নিমিত্তে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন:

১. দুর্বল প্রকৃতি ও দোদুল্যমান ঈমানদার লোকদেরকে সম্পদ ও পদের প্রলোভন দেওয়া, অথবা নারীর টোপ দেওয়া, যেন তারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ও শ্লোগান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ও প্রচার করতে পারে। অবশ্য তার পূর্বেই তারা তাদের প্রতারণার শিকার লোকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায়, যেগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে,

সেগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরে যেন মানুষ তাদেরকে আলেম, চিন্তাবিদ ও প্রচুর জাভা হিসেবে জানে এবং সাধারণ লোকদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাদের দ্বারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করায়, এভাবে তারা অনেক মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

২. কতিপয় লোককে তারা পাশ্চাত্য দেশে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদীদের আশ্রমে লালন করে এবং তাদেরকে একাডেমিক বিভিন্ন নামী-দামী পদবি প্রদান করে, যেমন ‘ডক্টরেট’ অথবা ‘প্রফেসর’ ইত্যাদি। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাভর্তন করার পর দ্বীনকে বিকৃত ও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের অস্তিত্ব কতটুকুন ক্ষতিকর; অথচ তারাই সুশীল নামে খ্যাত, স্কুল-কলেজ ও ভার্শিটির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যাস্ত।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের অপর একটি কূটকৌশল হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্মকে বিভক্ত করা, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমালোচনা ও লেখা-লেখি করা এবং মানুষদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখা। এ লক্ষ্যে তারা দীনি ছাত্র, ধর্মীয় আলেম ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী দাঈদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়, যেন তারা মানুষদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেশ-নসিহত প্রদানের পরিবর্তে তর্কে ব্যস্ত থাকে।

৪. দীনি আলেম, ধর্মীয় ছাত্র ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দাঈদেরকে রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পশ্চাৎগামী, চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা। আরো প্রচার করা যে, তারা পদ, সম্পদ ও নারী লোভী, যেন মানুষেরা তাদের কথায় বিশ্বাস না করে ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ময়দান উন্মুক্ত হয়।

৫. বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও আলেমদের ইখতিলাফ নিয়ে বেশী আলোচনা করা, যেন মানুষ জানে দ্বীন মতবিরোধের স্থান এবং দীনি আলেমদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। এভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে শিখবে যে, দ্বীনের কোনো বিষয় অকাট্য ও চূড়ান্ত নয়, অন্যথায় এতো বিরোধ সংগঠিত হত না। ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা এ দিকটার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কুপ্রভাব ছড়ানোর লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়কে তারা বড় আকারে পেশ করে, যার অর্থ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

৬. পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ভার্শিটি ও অপরিচিত কালচার সেন্টার নির্মাণ করা। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম দেশে নির্মিত হলেও পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। ইসলামের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাস্প ছড়ানোর কাজও করে

ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক, দার্শনিক ও মনোবিদ্যা বিভাগে তাদের পদচারণা ও প্রচারণা খুব বেশী।

৭. শরীয়তের কতক বিধান, যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে, তার উপর স্থানকাল-পাত্র ও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জমে থাকা। এভাবে তারা শরীয়তের ভুল ও বিকৃত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

উদাহরণত শরীয়তের একটি নীতি রয়েছে: ‘মাসালেহে মুরসালাহ’ (জনস্বার্থ), এ নীতিকে তারা উল্টোভাবে বুঝে ও ভুল পথে প্রয়োগ করে, অতঃপর তার দোহাই দিয়ে ইসলামের যে অংশ তারা পছন্দ করে না তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে, যেকারণে মুসলিম দেশে ধীরেধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুত হচ্ছে।

অনুরূপ শরীয়তের আর একটি নীতি রয়েছে: “দু’টি ক্ষতিকর বস্তু থেকে কম ক্ষতিকর বস্তু ও দু’টি ফেতনা থেকে ছোট ফেতনাকে গ্রহণ কর”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও বৈধতা প্রদান করে”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “ফায়দা হাসিল করার চেয়ে ক্ষতি দূর করাই অধিক শ্রেয়”। অনুরূপ একটি নীতি হচ্ছে: “ইসলাম সর্বযুগে উপযোগী”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ফতোয়া ভিন্ন হয়”। এ জাতীয় নীতিকে তারা গলদভাবে প্রয়োগ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ এসব নীতিকে তারা কাফেরদের দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান, রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মুসলিম দেশে আমদানি করার হাতিয়ার হিসেবে গলদভাবে প্রয়োগ করে, যেন অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জেনে বদীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাদের এ কৌশল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, কারণ এতে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়, তারা ভাবে এসব তো শরীয়তের নীতি ও ইসলামের নিকট স্বীকৃত। তাদের এ কৌশলের মুখোশ উন্মোচনের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব প্রয়োজন, তবেই দীন থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হবে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝানো যাবে।

এখানে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, এ জাতীয় নীতির উপর তাদের ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তারা ইসলামের এসব নীতিতে বিশ্বাসী। আবার এ অর্থও নয় যে, যে-উৎস থেকে এসব বিধান এসেছে, সে ইসলামের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার উপর তাদের ঈমান রয়েছে, বরং এসব তাদের একটি বাহানা, এভাবে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত মতবাদ বাস্তবায়ন করতে চায়।

মুসলিমদের দায়িত্ব

লেখক যদি কোনো কিতাবের ব্যাপক প্রচার ও প্রসিদ্ধি চায়, তাহলে সে অবশ্যই মানুষকে আকৃষ্ট করা ও তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। অতএব যদি সত্যিই হয় যে, এ জাতীয় কিতাবের প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই, তাহলে তাদের অনাগ্রহের জন্য আপনারাও কম দায়ী নন, তাদের অনাগ্রহের প্রতি আপনাদের সম্ভ্রুতি প্রকাশ পাচ্ছে। তাদেরকে আপনারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেননি, তাদেরকে বলেননি এক বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে অপর বিষয় ত্যাগ করা সমীচীন নয়। এরূপ ঘটতে থাকলে মানুষেরা ইসলামকে কোনো এক ইবাদত, অথবা কোনো এক আদব অথবা কোনো এক অভ্যাসে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলবে, বরং অনেকের নিকট তো এখনই সালাত, সিয়াম ও কতক জিকিরের মাঝে ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ ইসলামকে সীমাবদ্ধ করেছে শুধু সদাচরণে। কারো নিকট বিশেষ অবস্থা অথবা বিশেষ আকৃতি অথবা বিশেষ পোশাকের নাম-ই ইসলাম। কারো নিকট কয়েকটি ফিকহি মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ইসলাম, অথবা কিছু বিষয়-আশয় ও কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় জানাই ইসলাম, ইত্যাদি।

আপনি যদি তাদেরকে ইসলামের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার প্রতি দাওয়াত দেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন আল্লাহর তাওহীদ, আখিরাতে প্রতি ঈমান, আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা ও তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরা; অথবা ইসলামী খিলাফত পুনরুদ্ধার ও কায়েম করার আলোচনা এবং কুফরি মতবাদসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করেন, যেমন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি, তাহলে তারা ভাববে আপনি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন। তারা বলবে, ‘এটাই তো রাজনীতি, আর রাজনীতির সাথে দ্বীনকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।’

এ জাতীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদের জন্য যদি সেসব বিষয় জুমার খুতবা, মসজিদের হালকা, বিভিন্ন সেমিনার ও ছোট ছোট কিতাবে প্রকাশ করা হত, যা পড়া ও বুঝা সহজ, তাহলে তাদের থেকে এরূপ বিচ্যুতিমূলক কথা কখনো বের হত না।

আমরা লেখক বা প্রকাশক যাই হই, পাঠকদের চাহিদা ও বেচাকেনার বাজার গরম রাখার জন্য দ্বীনকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা, দ্বীনকে বিকৃত করা, তার এক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে অপর বিষয়কে ত্যাগ করার মত মারাত্মক ক্ষতিকর কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ও তাতে অংশগ্রহণ না করা ওয়াজিব। এরূপ আচরণ আমাদের থেকে প্রকাশ পেলে প্রকারান্তরে আমরাই দ্বীনের গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে ফেলব এবং দ্বীনকে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার ক্ষেত্রে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সহযোগী হয়ে যাব।

কোনো লেখক বা প্রকাশক বলতে পারেন: “আমরা এ বিষয়ে লেখি না, কারণ এগুলো অনেক বড় ও গভীর বিষয়, এতে ভুল করা সামান্য ব্যাপার নয়, এসব বিষয়ে লেখার জন্য অনেক ইলম প্রয়োজন, যা আমাদের নেই”। হ্যাঁ এ কথাও সত্য, কারণ বর্তমান যারা এ বিষয়ে

লিখছে, তারা তার উপযুক্ত নয়... তার কারণ হয়তো তারা বিষয়টি বুঝেন না, অথবা ভুলভাবে বুঝেন-তাদের জ্ঞান এ ব্যাপারে পরিপক্ব নয়, যদি এরূপ সঠিক হয় –এটাই সঠিক- অনেকের ক্ষেত্রে, তবে বড় আলেমগণ কোথায়, কোথায় ওলামা মাশায়েখগণ, এটা যদি তাদের দায়িত্ব না হয়, তাহলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে তাদের কাজ কী?!

ইসলাম প্রচার ও ব্যাপক করার জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে ভার্শিটি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষক, প্রফেসর ও অধ্যাপকদের নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করা জরুরি:

১. বিশুদ্ধ শিক্ষানীতি ও সিলেবাস তৈরি করা, যেন শিক্ষার প্রত্যেক শাখা ইসলামের সেবায় ব্যবহার হয়, একমাত্র গবেষণাই যেন তার উদ্দেশ্য না হয়। উল্লেখ্য যে, আমাদের দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাতে অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না, আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আল্লাহর সৃষ্ট, অতএব বিজ্ঞান ও দ্বীনের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই, তাই বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারকে ঈমানের সেবক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনুরূপ নাস্তিকতার বাতুলতা প্রমাণ ও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিজ্ঞানের অনেক মূলনীতিকে ব্যবহার করা যায়, যাতে খোদ নাস্তিকরা বিশ্বাসী, যার বিপরীত কোনো নীতি তারা বিশ্বাস করে না। এ জন্য ছাত্রদের সিলেবাস নির্ধারণের সময় এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরি। এগুলো অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝাবে, তাতে ইশারা ও ইঙ্গিত প্রদান করা যথেষ্ট নয়। এ বিষয়টিকে যথাযথভাবে বুঝা ও বাস্তবায়ণ করা সিলেবাস প্রণয়ন ও নির্ধারণকারীদের উপর একান্ত কর্তব্য।

২. শিক্ষা উপকরণকে তাতে প্রবিষ্ট কুফরি ও গোমরাহি মুক্ত করা, হতে পারে কোনো বই এমন লোকের তৈরি, যে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা দ্বীন বিদ্বেষী। তাই মুসলিম শিক্ষক কখনো বই-পুস্তক যেভাবে আছে সেভাবে পাঠদান করে ক্ষান্ত হয় না, এরূপ করা বৈধও নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে, বই-পুস্তকে বিদ্যমান ভ্রষ্টতা ছাত্রদেরকে বলা ও তা থেকে সতর্ক করা। অতএব শিক্ষককে শুধু বিষয়ের শিক্ষক হলে চলবে না, তাকে অবশ্যই এ বিদ্যাগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ করতে হবে এবং তাতে বিদ্যমান সন্দেহগুলো দূর করতে হবে। এভাবে তিনি নিজেকে একজন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঈ, উপদেশদাতা ও সঠিক পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

৩. ইসলামকে ভালোভাবে বুঝানো, অথবা ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠা করা, অথবা মুসলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া, তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করা, অথবা ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার যখন কোনো সুযোগ আসবে শিক্ষক সেটাই লুফে নিবেন।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষককে অবশ্যই আধুনিক ও শর'য়ী উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি, তাহলে তিনি সঠিকভাবে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, যা দিয়ে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন।

"সেকুলারিজম বনাম ইসলাম: দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ" - এই শিরোনামটি মূলত ইসলামপন্থী বা রক্ষণশীল মুসলিম চিন্তাবিদদের একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যারা মনে করেন যে সেকুলার মতবাদ ইসলামকে তার সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ রূপ থেকে বিচ্যুত করে কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে প্রধান যুক্তিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (দ্বীন) ধারণা

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো এটি একটি "দ্বীন" বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় - সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে কেবল ইবাদত-বন্দেগী (নামাজ, রোজা) নয়, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও শান্তি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা মূলনীতি দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ইসলাম কেবল গির্জার মতো উপাসনালয়ভিত্তিক ধর্ম নয়, বরং এটি জীবন চলার একটি বিস্তারিত কাঠামো

২. সেকুলারিজমের মূলনীতি ও সীমাবদ্ধতা

সেকুলারিজমের মূল কথা হলো রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখা। এটি ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আরাধনার বিষয় হিসেবে দেখে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়নকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার কথা বলে। সমালোচকদের মতে, এখানেই "ফাঁদ" তৈরি হয়। কারণ, সেকুলার কাঠামোতে রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের তৈরি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে তা পরিবর্তন হতে পারে। এর ফলে, ইসলামের যে শাস্ত ও অপরিবর্তনীয় বিধান (শরীয়ত) রয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগের সুযোগ থাকে না

৩. "ফাঁদ" হিসেবে দেখার কারণ

ইসলামী চিন্তাবিদরা কয়েকটি কারণে সেকুলারিজমকে একটি "ফাঁদ" বা ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল হিসেবে দেখেন:

- ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন: ইসলামে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়াত) আল্লাহর। আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল তাঁর। সেকুলার ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

মানুষের হাতে ন্যস্ত হওয়ায়, তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে বলে মনে করা হয়।

- **নৈতিকতার পরিবর্তন:** সেকুলার সমাজে নৈতিকতার মানদণ্ড পরিবর্তনশীল মানবিক যুক্তি বা সামাজিক মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এর বিপরীতে ইসলাম একটি স্থির ও ঐশী নৈতিক কাঠামো প্রদান করে। সমালোচকদের মতে, সেকুলারিজম মানুষকে ঐশী নির্দেশনা থেকে দূরে সরিয়ে অনৈতিকতার দিকে ঠেলে দেয়।

ধর্মের সার্বজনীনতা খর্ব করা: সেকুলারিজম ধর্মকে পাবলিক স্ফেরার বা জনজীবন থেকে সরিয়ে প্রাইভেট স্ফেরার বা ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এর মাধ্যমে মুসলিমদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করার পথ রুদ্ধ করা হয়।

- **ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট:** অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ সেকুলারিজমকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে দেখেন, যা মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করার জন্য আমদানি করা হয়েছিল। এটি ইসলামি প্রভাবকে আইনি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরাতে সাহায্য করেছিল।

দার্শনিক ভিত্তি ও সংঘাত

ইসলামী দৃষ্টিকোণ: দ্বীন ও দুনিয়া অবিচ্ছেদ্য

ইসলামী দর্শন অনুসারে, জীবন একটি অবিভাজ্য একক। "দ্বীন" শব্দটি কেবল ধর্মীয় আচার-আচরণ নয়, বরং জীবন পরিচালনার একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতিকে বোঝায়। এর মূলনীতি হলো তাওহীদ (একত্ববাদ), যার অর্থ কেবল আল্লাহর ইবাদত নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সার্বভৌমত্ব (হাকিমিয়াত) মেনে নেওয়া। এই মতবাদ অনুযায়ী:

- **আইনের উৎস:** মানব জীবনের সকল আইনের উৎস হতে হবে কুরআন ও হাদীস।
- **রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্র হলো আল্লাহর আইন বা শরীয়ত বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম।

সেকুলার দৃষ্টিকোণ: রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদ

সেকুলারিজমের উদ্ভব মূলত ইউরোপে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে। এর মূল যুক্তি হলো:

- **যুক্তি ও মানবতাবাদ:** রাষ্ট্র পরিচালনা হবে মানবীয় যুক্তি, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কোনো ধর্মীয় প্রত্যাশার ভিত্তিতে নয়।

- **নিরপেক্ষতা:** রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করবে না বা কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য করবে না, সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।

"দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ" - সমালোচনার মূল যুক্তি

যারা সেক্যুলারিজমকে "ফাঁদ" হিসেবে দেখেন, তাদের মূল অভিযোগ হলো, এটি ইসলামকে তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে বঞ্চিত করে একটি ক্ষমতাহীন ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত করে।

১. সার্বভৌমত্বের দ্বন্দ্ব (Conflict of Sovereignty):

সেক্যুলার রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের বা সংসদের হাতে থাকে, যারা সংবিধানের মাধ্যমে আইন তৈরি করে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সরাসরি লঙ্ঘন। সমালোচকদের মতে, যখন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষ নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন সে নিজেকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে এবং প্রকৃত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়।

২. শরীয়াহ আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করা:

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শরীয়াহ আইন, যা পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত। সেক্যুলার কাঠামোতে, শরীয়াহ আইনকে প্রায়শই আধুনিক মানবাধিকার বা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে দেখা হয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে এর প্রয়োগ সীমিত বা নিষিদ্ধ করা হয়। এটি মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্মের একটি অপরিহার্য অংশ পালনে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. নৈতিক মানদণ্ডের পরিবর্তনশীলতা:

সেক্যুলার সমাজে নৈতিকতা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে পারে (যেমন: সমকামিতার বৈধতা)। ইসলামী চিন্তাবিদরা যুক্তি দেন যে, যখন ধর্মকে জনজীবন থেকে সরানো হয়, তখন নৈতিকতার বাঁধন আলগা হয়ে যায় এবং সমাজ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তাদের মতে, ইসলাম প্রদত্ত স্থির নৈতিক মানদণ্ডই একটি সুস্থ সমাজ নিশ্চিত করতে পারে।

৪. রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা তৈরি:

"দ্বীনকে ব্যক্তিগত করে রাখার ফাঁদ" মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন, সেক্যুলারিজম মুসলিমদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এটি মুসলিমদের বোঝাতে চায় যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত করলেই চলবে। এটি ইসলামী আন্দোলনের ধারণার পরিপন্থী।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং ইসলাম ভিন্ন দুটি ধারণা, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক রাখা এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য না দেওয়া। অন্যদিকে, ইসলাম হলো একটি ধর্ম, যার নিজস্ব বিশ্বাস ও আইন (শরিয়ত) রয়েছে। এই দুটি ধারণার মধ্যে একটি

প্রধান পার্থক্য হলো, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আইন ধর্মীয় আইনের ওপর নির্ভরশীল হয় না, কিন্তু ইসলামের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রাধান্য থাকা উচিত।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)

- **সংজ্ঞা:** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতা হলো রাষ্ট্র ও নাগরিক বিষয়গুলোকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার একটি নীতি।
- **রাষ্ট্রীয় নীতি:** এই নীতিতে রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা করে না।
- **নাগরিক অধিকার:** ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে মানুষ যেকোনো ধর্ম পালন করতে পারে বা কোনো ধর্ম পালন না-ও করতে পারে।
- **আইন:** রাষ্ট্রের আইন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না, বরং মানবিক এবং নাগরিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করে।

ইসলাম (Islam)

- **সংজ্ঞা:** ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যা ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশনা প্রদান করে।
- **রাষ্ট্রীয় নীতি:** ইসলামী চিন্তাধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধান ও শরিয়তের প্রয়োগ কাম্য।
- **নাগরিক অধিকার:** ইসলামে নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা থাকলেও, রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **আইন:** ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রের আইন আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা উচিত এবং শরিয়তের বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

মূল পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	ইসলাম
রাষ্ট্র ও ধর্ম	ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক রাখা হয়।	ধর্ম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
আইন	আইন ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত থাকে।	শরিয়ত বা ধর্মীয় আইনকে আইনের ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, এটি ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং
স্বাধীনতা কিন্তু রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব ধর্মীয় অনুশাসনকে রাষ্ট্রের একটি
করে না। গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ রাশিয়ান, ব্রিটিশ এবং ফরাসি
উপনিবেশবাদের মুখোমুখি হয়ে ইসলামী বিশ্বকে শক্তিশালী করার উপায় হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করেছিলেন। কেউ কেউ
ধর্মনিরপেক্ষতাকে এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থে সমর্থন করেছেন যা শরীয়তের কোনও একক ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেয় না (আলী আবদেল
রাজিক , মোহাম্মদ আরকুন এবং মাহমুদ মোহাম্মদ তাহা); [6] যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলাম লঙ্ঘন করবে
না/করবে না (আবদুল্লাহ সাইদ); [7] এবং এটি সংবিধানবাদ এবং মানবাধিকারের সাথে মিলিত হয়ে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি
চেয়ে ইসলামী ইতিহাসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ (আবদুল্লাহি আহমেদ আন-না'ইম)। [6] গোঁড়া ইসলামী পণ্ডিত এবং
ইসলামবাদের (রাজনৈতিক ইসলাম) সমর্থকরা ইসলামকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ রাখার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এমন
একটি ইসলামের পক্ষেও জোরালোভাবে সমর্থন করেন যা আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং নাগরিকদের জীবনের অন্যান্য সমস্ত
দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। [2][8] ইসলামপন্থী পথিকৃৎ আবুল আ'লা মওদুদী দাবি করেছিলেন যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের লক্ষ্য বহু-ধর্মীয়
সমাজে উত্তেজনা এবং বিভাজন হ্রাস করা নয়, বরং "নৈতিকতা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনার সীমাবদ্ধতা" এড়ানো, [9] এবং এইভাবে "সমাজের
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে সমস্ত নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র বা মানবিক শালীনতা" দূর করা। [10]
ইসলামী বিশ্বের প্রাক-আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যে কিছুটা বিচ্ছিন্নতা প্রদর্শন করেছিল, খিলাফতের ক্ষমতা
হারানো এর একটি প্রধান কারণ ছিল, এমনকি যদি তারা কোনও সরকারী ধর্ম বা ধর্ম-ভিত্তিক আইন ছাড়াই একটি রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণা মেনে
চলে না। [11] আজ, কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে বা বিবেচনা করা হয়। তাদের
অনেকেরই একটি দ্বৈত আইনি ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে মুসলমানরা পারিবারিক এবং আর্থিক বিরোধ *শরিয়া আদালত* এ আনতে পারে যার
এখতিয়ার দেশ থেকে দেশে পরিবর্তিত হয় তবে সাধারণত বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং অভিভাবকত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। [12]
ফার্সি বা তুর্কি ভাষায় "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটির সাথে ছবছ মিল আছে এমন কোনও শব্দ নেই। মনসুর আলমের মতে, মুসলমানদের চারটি
প্রধান ভাষা - আরবি, ফার্সি, উর্দু -তে ধর্মনিরপেক্ষতার "সাধারণ এবং প্রচলিত" অনুবাদ হল *লাদেনিয়া* বা *গাইর-মাজহাবী* এবং *মুলহিদ্দীন* যার
অর্থ "ধর্মবিরহীন" বা "ধর্মহীন"। [21] আলম প্রতিবাদ করেন যে এই অনুবাদগুলির বিপরীতে, "পশ্চিমা ভাষাগুলিতে" পাওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার
সংজ্ঞাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ "ধর্মবিরোধী বা ঈশ্বরবিরোধী নয়", বরং ধর্মের স্বাধীনতা এবং ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার
অর্থ এসেছে এবং এর বিপরীতও। [21] *দ্য অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড* এ নাদের হাশেমী লিখেছেন, আরবি
ভাষায় অনুবাদ হিসাবে সাধারণত ব্যবহৃত আরও দুটি শব্দ রয়েছে: *ilmānīyah* (বিজ্ঞানের জন্য আরবি শব্দ
থেকে) [4] এবং *almanīyah* (স্পষ্টতই "বিশ্ব" এর জন্য আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত)। [1][4] (পরবর্তী শব্দটি, উনবিংশ শতাব্দীর
শেষের দিকে খ্রিস্টান লেবানিজ পণ্ডিত বুক্স আল-বুস্তানি কর্তৃক লিখিত *মুহিত আল-মুহিত অভিধানে প্রথম আবির্ভূত*
হয়েছিল) [22][23] ফার্সি ভাষায়, ধার করা শব্দ *"sekūlarizm"* পাওয়া যায়, যেখানে তুর্কি ভাষায় *"laiklik"* (ফরাসি
"laïcité" থেকে ধার করা) এবং *"sekülerizm"* উভয়ই শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত হয়; যদিও তুর্কি সাহিত্যের মধ্যে
উভয়ের সংজ্ঞা ভিন্ন হতে পারে, এই দুটি শব্দের অনিশ্চিত এবং ভুল ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তির কারণে, প্রেক্ষাপট এবং উৎসের উপর
নির্ভর করে অর্থ ভিন্ন হয়

শাস্ত্রীয় ভিত্তি

মনসুর আলমের (যিনি মুসলিম সরকারের নীতি হিসেবে "কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা" কে
বিবেচনা থেকে প্রত্যাখ্যান করেন) মতে, কুরআনের যেসব আয়াত "স্পষ্টভাবে এবং
দ্ব্যর্থহীনভাবে" ধর্মের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে, সেগুলোতে নবী (সাঃ) কে মানবজাতির কাছে

"আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার" দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে; এবং যা প্রতিটি ব্যক্তিকে "তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের জন্য" ব্যক্তিগত দায়িত্ব দেয়: [\[25\]](#)

- যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কাজ পরিচালনা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে দান করে; এবং যারা অত্যাচারিত হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। (৪২:৩৮-৩৯)
- যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবায়ান (তারকা পূজারী), যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (২:৬২) [\[২৫\]](#)
- (হে মুসলিমগণ) বলো, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তার বংশধরদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, (তাঁর ১২ পুত্র) এবং মুসা ও হারুনকে যা দান করা হয়েছে এবং (সকল নবীদের) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি। আমরা তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। (২:১৩৬) [\[২৫\]](#)
- *লা ইকরাহা ফিদ্দিন*; ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি নেই। (২:২৫৬) [\[২৫\]](#)
- (হে নবী!) এই কাফেরদের বলুন, আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো, আর তোমরাও তার ইবাদত করবে না যার ইবাদত আমি করি, আর আমি তার ইবাদত করব না যার ইবাদত তোমরা করো, আর তোমরাও তার ইবাদত করবে না যার ইবাদত আমি করি, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম। (109) [\[25\]](#)
- তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসেছে, সুতরাং যে কেউ দেখে, সে নিজের জন্যই দেখে, আর যে অন্ধ হয়ে যায়, সে নিজেরই ক্ষতি করে, আর আমি (মুহাম্মদ) তোমাদের উপর নজরদারিকারী নই। (৬:১০৪) [\[২৫\]](#)
- আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের উপর নজর রাখেন, আর তুমি (হে মুহাম্মদ) তাদের উপর দায়িত্বশীল নও। (৪২:৬)
- যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করত না। আর আমরা তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করিনি এবং তুমি তাদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্তও নও। (৬:১০৭) [\[২৫\]](#)

- তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি একটি আইন এবং একটি স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন। (৫:৪৮) [\[২৫\]](#)

জাকির আল ফারুকী এবং মো. রোকনুজ্জামান সিদ্দিকী মুহাম্মদের মদিনা চুক্তি (যা মদিনার সংবিধান নামেও পরিচিত) কে "ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [\[২৬\]](#) [\[২৭\]](#)

পণ্ডিত বার্নার্ড লুইস উল্লেখ করেছেন যে "প্রথম গঠনমূলক শতাব্দী" তে, খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্র থেকে পৃথক ছিল এবং প্রায়শই রাষ্ট্র দ্বারা নিপীড়িত ছিল, যখন "এর প্রতিষ্ঠাতার জীবদ্দশায় ইসলামই ছিল রাষ্ট্র... এইভাবে ইসলাম শুরু থেকেই ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে যুক্ত ছিল"। [\[২৮\]](#)

ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রমাণ

মদিনার সংবিধান

অনেক পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন যে ধর্ম ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পৃথকীকরণ প্রাথমিক ইসলামী ইতিহাসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুদানী বংশোদ্ভূত ইসলামী পণ্ডিত আবদুল্লাহি আহমেদ আন-নাঈম যুক্তি দিয়েছেন যে সংবিধানবাদ, মানবাধিকার এবং পূর্ণ নাগরিকত্বের উপর নির্মিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ইসলামী ইতিহাসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। [\[৬\]](#) ইরা এম. ল্যাপিডাস উল্লেখ করেছেন যে নবী মুহাম্মদ যখন উম্মাহর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি একত্রিত হয়েছিল, যার ফলে একটি অ-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ল্যাপিডাস বলেছেন যে দশম শতাব্দীর মধ্যে, মুসলিম বিশ্বের কিছু সরকার ধর্ম ও রাজনীতির কার্যকর পৃথকীকরণ গড়ে তুলেছিল, কারণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ "সেনাপতি, প্রশাসক, গভর্নর এবং স্থানীয় প্রাদেশিক প্রভুদের হাতে চলে গিয়েছিল; খলিফারা সমস্ত কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন"। এই সরকারগুলি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী ছিল এবং ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, কিন্তু ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তাদের পরিচালিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক তাদের নিজস্ব শ্রেণিবিন্যাস এবং ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করেছিল:

একই সময়ে, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি তাদের শাসনকারী রাজ্য বা সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছিল। *উলামা/রা* স্থানীয় সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন বিচারক, প্রশাসক, শিক্ষক এবং মুসলমানদের ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। ধর্মীয় অভিজাতদের ধর্মীয় সম্পৃক্ততা অনুসারে সুন্নি আইন স্কুল, শিয়া সম্প্রদায় বা সুফি *তরিকা* তে সংগঠিত করা হত। [...] শরিয়া - মুসলিম আইন - থেকে উদ্ভূত বিস্তৃত বিষয়গুলিতে, স্কুলগুলির 'উলামা'রা একটি স্থানীয় প্রশাসনিক এবং সামাজিক অভিজাত গঠন করেছিলেন যাদের কর্তৃত্ব ধর্মের উপর ভিত্তি করে ছিল। [\[২৯\]](#)

ল্যাপিডাস যুক্তি দেন যে, মুসলিম সাম্প্রদায়িক জীবনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিকগুলি খলিফাদের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ, খলিফাদের প্রকৃত কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন ধর্মীয় কার্যকলাপের উত্থান এবং হাম্বলি আইনশাস্ত্রের উত্থানের মাধ্যমে পৃথক হয়ে যায়।^[30] জাকির আল ফারুকীর মতে, বেশিরভাগ মুঘল শাসকের "সহনশীল এবং উদার" শাসনামলে "শতাব্দী ধরে" ধর্মনিরপেক্ষতা পাওয়া গিয়েছিল^[31] "বিশেষ করে, আকবরের শাসনামলে (1556-1605)"^[32]

গবেষক অলিভিয়ার রায় যুক্তি দেন যে, "হিজিরার প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকেই সুলতান ও আমিরদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতার মধ্যে একটি কার্যত বিচ্ছেদ" "সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল"। তবুও, মুসলিম বিশ্বে যা অভাব ছিল তা হল "এই স্থানের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা"। শরিয়াহর বাইরে কোনও ইতিবাচক আইন বিকশিত হয়নি। সার্বভৌমের ধর্মীয় কাজ ছিল ইসলামী সম্প্রদায়কে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্ষা করা, শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা, জনকল্যাণ (মাসলাহা) নিশ্চিত করা। রাষ্ট্র ছিল মুসলমানদের ভালো মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে সক্ষম করার একটি হাতিয়ার এবং যদি সুলতান তা করেন তবে মুসলমানরা তার আনুগত্য করবে। শাসকের বৈধতা "টাকা মুদ্রা করার অধিকার এবং তার নামে শুক্রবারের নামাজ (জুমু'আ খুতবা) পড়ার অধিকার দ্বারা প্রতীকী ছিল।"^[33]

সেই সময়ে অনেক মুসলিম উমাইয়া খিলাফতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে দেখত, যাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতি এবং ধর্মের একীকরণের অভাবকে অস্বীকার করেছিলেন। এই ধারণাটি খিলাফতের সীমানা ছাড়িয়ে মুসলিম শাসন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অবিরাম যুদ্ধের দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছিল।^[34]

প্রাথমিক ইসলামী দর্শনে, আভেরোস "দ্য ডিসিসিভ ট্রিটিজ"-এ একটি যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন যেখানে তিনি আশ'আরি ধর্মতত্ত্ব থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। এই কারণে, কেউ কেউ আভেরোইজমকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্বসূরী বলে মনে করেন।^[35]

ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগ

মুসলিম আধুনিকতাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ইউরোপ থেকে মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায়, আলোকিত-পরবর্তী আধুনিকতার অনেক ধারণার সাথে আমদানি করা হয়েছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাথমিক বিতর্ক মূলত ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শাসনব্যবস্থায় ইউরোপীয় সাফল্যের সাথে এই সম্পর্ক কীভাবে সম্পর্কিত তা নিয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল।^[36] ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কিত বিতর্কে, (ইন) ইসলামী বিশ্বে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পৃথকীকরণ বা খলিফার মর্যাদা, সবচেয়ে বড় বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল।^[37] অনেক ইসলামী আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ (বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে 1970 এর দশক পর্যন্ত) ইসলামী বিশ্বে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অবিচ্ছেদ্যতার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাদের আদর্শ ইসলামী বিশ্বের মধ্যে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা (স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের মতো ধারণাগুলির সাথে) বর্ণনা করেছিলেন। (বাথিস্টদের, অমুসলিম আরব সহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের, বহু-স্বীকারোক্তিমূলক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির অনুসন্ধানও ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থনের অংশ ছিল।^[38])

একজন বিশিষ্ট মুসলিম আধুনিকতাবাদী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫) তার "আল-ইদতিহাদ ফি আল-নাসরানিয়া ওয়া আল-ইসলাম" (খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামে নির্যাতন) বইয়ে দাবি করেছেন^[39] যে ইসলামী বিশ্বে কারোরই একচেটিয়া ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে খলিফারও সাধারণ মুসলমানদের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল না কারণ খলিফা ত্রুটিমুক্ত ছিলেন না এবং যার কাছে ঐশ্বরিক ওহী পাঠানো হয়েছিল তিনিও ছিলেন না। আবদুহ যুক্তি দিয়েছিলেন যে খলিফার উম্মাহর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত কিন্তু তাকে শাসন করা উচিত নয়; উম্মাহর ঐক্য হল একটি নৈতিক ঐক্য যা জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া রোধ করে না।^[40]

আবদুর রহমান আল-কাওয়াকিবি (আনুমানিক ১৮৫৪-আনুমানিক ১৯০২) তার *তাবাই' আল-ইস্তিবদাদ* (অত্যাচারের বৈশিষ্ট্য) বইয়ে ধর্ম এবং স্বৈরাচারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন,^[41] যুক্তি দিয়েছেন যে "যদিও বেশিরভাগ ধর্মই মানুষকে ধর্মীয় পদধারীদের দাসত্বে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল যারা তাদের শোষণ করেছিল, মূল ইসলাম গণতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছিল।"^[42] আল-কাওয়াকিবি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মানুষ একটি অ-ধর্মীয় জাতীয় ঐক্য অর্জন করতে পারে, তিনি বলেছিলেন: "আসুন আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনের যত্ন নিই এবং পরবর্তী পৃথিবীতে ধর্মগুলিকে শাসন করতে দিই।"^[42] অধিকন্তু, তার দ্বিতীয়

বই *উসুল কুরা* (গ্রামের জননী) -এ ধর্ম এবং রাষ্ট্রের প্রশ্ন সম্পর্কে তার সবচেয়ে স্পষ্ট বক্তব্য বইটির একটি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি ভারতের মুসলিম পণ্ডিত এবং একজন আমিরের মধ্যে একটি সংলাপ উপস্থাপন করেছেন। আমির তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন যে "ধর্ম এক জিনিস এবং সরকার অন্য জিনিস... ইসলামে ধর্মের প্রশাসন এবং সরকারের প্রশাসন কখনই একত্রিত ছিল না।"

ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সম্পর্কে রশিদ রিদার (১৮৬৫-১৯৩৫) চিন্তাভাবনার সাথে আবদুহ এবং আল-কাওয়াকিবির কিছু মিল ছিল। পণ্ডিত এলিজার তৌবেরের মতে:

তিনি মনে করতেন যে ইসলাম অনুসারে 'জাতির শাসন তার নিজের হাতে... এবং এর সরকার এক ধরনের প্রজাতন্ত্র। খলিফার আইনের দিক থেকে সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তিনি কেবল ধর্মীয় আইন এবং জাতির ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেন।' এবং তিনি আরও বলেন: 'মুসলিমদের জন্য, খলিফা ত্রুটিমুক্ত (মা'সুম) নন এবং তিনি ওহীর উৎসও নন।' এবং তাই, 'জাতির ইমাম-খলিফাকে পদচ্যুত করার অধিকার রয়েছে, যদি তারা এটি করার কোনও কারণ খুঁজে পায়।' ^[43]

"আরব সাম্রাজ্যের সাধারণ জৈব আইন" শীর্ষক একটি নথিতে রিদা ভবিষ্যৎ আরব সাম্রাজ্য সম্পর্কে তার ধারণার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রিদা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতের সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রশাসনিক নীতি একজন রাষ্ট্রপতি, সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে নির্বাচিত ডেপুটিদের একটি কাউন্সিল এবং ডেপুটিদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত একটি মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। সেখানে, খলিফাকে 'সাধারণ জৈব আইন' স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করবেন। রিদার আদর্শ ইসলামী সাম্রাজ্য বাস্তবে একজন রাষ্ট্রপতি দ্বারা পরিচালিত হবে, যেখানে খলিফা কেবল ধর্মীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং সাম্রাজ্যের জৈব আইন স্বীকৃতি দিতে এবং তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ^[44]

উপরে যেমন দেখা গেছে, ইসলামী বিশ্বে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পৃথকীকরণ সম্পর্কে এই যুক্তিগুলি খিলাফতের উপস্থিতির সাথে ব্যাপকভাবে সম্পর্কিত ছিল। অতএব, ১৯২৪ সালে তুর্কি সরকার কর্তৃক খিলাফতের বিলুপ্তি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই ধরনের যুক্তিগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলির চেয়েও বিতর্কিত একটি রচনা হল ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থ, *আল-ইসলাম ওয়া উসুল আল-হুকম* (ইসলাম এবং শাসনের ভিত্তি) ^[45], যা একজন ইসলামী পণ্ডিত এবং শরিয়া বিচারক আলী আবদ আল-রাযিক (১৮৮৮-১৯৬৬) দ্বারা রচিত। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কুরআন এবং হাদিসে এমন কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই যা একটি সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করে - খলিফার কর্তৃত্ব গ্রহণ করা একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।

তদুপরি, তিনি দাবি করেছিলেন যে উম্মাহর রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়াও প্রয়োজনীয় নয় এবং ধর্মের এক ধরনের সরকারের সাথে অন্য কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইসলামে কোনও কিছুই মুসলমানদের তাদের পুরানো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করতে এবং মানবিক চেতনা এবং জাতির অভিজ্ঞতার নতুন ধারণার ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিষেধ করে না।^[46] এই প্রকাশনাটি তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যখন তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে ধর্মকে সরকার এবং রাজনীতি থেকে পৃথক করা যেতে পারে; এবং পরে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবদ আল-রাজিকের মধ্যে "আমরা প্রথমবারের মতো ইসলামের সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়াভাবে ধর্মীয় চরিত্রের একটি সুসংগত, দ্ব্যর্থক তাত্ত্বিক দাবির সাথে দেখা করি"।^[47]

মিশরীয় লেখক তাহা হুসেন (১৮৮৯-১৯৭৩) মিশরীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের পক্ষে ছিলেন। হুসেন বিশ্বাস করতেন যে মিশর সর্বদা পশ্চিমা সভ্যতার অংশ ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের নবজাগরণ ঘটেছিল এবং তারা পুনরায় ইউরোপীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাছে আধুনিক বিশ্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল যে এটি ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে কার্যত বিচ্ছেদ এনেছে, প্রতিটি তার নিজস্ব ক্ষেত্রে। তাই ইউরোপ থেকে সভ্যতার ভিত্তি খ্রিস্টধর্ম ছাড়া নেওয়া বেশ সম্ভব। অধিকন্তু, তিনি বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলমানদের পক্ষে এটি সহজ, কারণ ইসলামের কোনও পুরোহিতত্ব নেই, এবং তাই তাঁর মতে, সমাজের উপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণে কোনও স্বার্থ ছিল না।^[48]

একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

২০১৩ সালের দিকে লেখা, মনসুর আলম যুক্তি দেন যে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পাকিস্তানে শিয়া, সুন্নি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে "রক্তপাতের মধ্যে নিমজ্জিত" হওয়ার ফলে "মসজিদ, ইমামবাড়া এমনকি কবরস্থানও পরিদর্শনের জন্য অনিরাপদ স্থান হয়ে উঠেছে"। সম্প্রদায়ের মেরুকরণের "একমাত্র প্রতিষেধক" হল খ্রিস্টানরা "কয়েকশ বছরের আন্তঃসম্পর্কীয় রক্তপাত" অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার পরে যা শিখেছে।^[49]

দ্য ন্যাশনালের একজন কলামিস্ট ফয়সাল আল ইয়াফাই ২০১২ সালে লিখেছিলেন যে আরব বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা হ্রাস পেয়েছে এবং "আরব বিশ্বে এমন কোনও প্রধান রাজনৈতিক দল নেই যা আজ ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে বোঝা যাবে।"^[50] পূর্ব অ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া

এবং ধর্মনিরপেক্ষতার একজন পণ্ডিত এবং গবেষক খালদুন এইচ. শামি যুক্তি দেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা এই অঞ্চলে সমস্যাযুক্ত, প্রায়শই নাস্তিকতা, উপনিবেশবাদ বা পশ্চিমীকরণের সাথে যুক্ত। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার একটি "মধ্যপ্রাচ্য মডেল"-এর উপর জোর দেন - কেবল পশ্চিমা বিভাগগুলি আমদানি করা নয়, বরং এমন একটি সংস্করণ যা স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় বৈচিত্র্য, সামাজিক এবং রাজনৈতিক রীতিনীতির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি এটিকে সংখ্যালঘু, সামরিকবাদ এবং রাষ্ট্র-ধর্মীয় সম্পর্কের মতো বিষয়গুলির সাথে সংযুক্ত বা উত্তেজনাপূর্ণ হিসাবেও স্থাপন করেন।^[51]

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং ইসলামিক অধ্যয়নের অধ্যাপক জন এল. এসপোসিতো উল্লেখ করেছেন:

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির উত্থান ঘটেছিল যাদের উন্নয়নের ধরণ পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টান্ত বা মডেল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত এবং ঋণী ছিল। সৌদি আরব এবং তুরস্ক দুটি মেরু অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায়। [...] বেশিরভাগ মুসলিম রাষ্ট্র জাতি গঠনে একটি মধ্যম পথ বেছে নিয়েছিল, পশ্চিমাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ নিয়েছিল এবং বিদেশী উপদেষ্টা এবং পশ্চিমা-শিক্ষিত অভিজাতদের উপর নির্ভর করেছিল।^[52]

এসপোসিতো আরও যুক্তি দেন যে অনেক আধুনিক মুসলিম দেশে, শাসক, রাষ্ট্র এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের বৈধতার উৎস হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামের ভূমিকা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যদিও ধর্ম ও রাজনীতির সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ ছিল না। যাইহোক, যদিও বেশিরভাগ মুসলিম সরকার পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ কোড দ্বারা অনুপ্রাণিত আইনি ব্যবস্থা দ্বারা ইসলামী আইন প্রতিস্থাপন করেছিল, মুসলিম পারিবারিক আইন (বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার) এখনও বলবৎ ছিল।^[53]

উপযুক্ততার প্রশ্ন

মতামত জরিপে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ মুসলিম বিশ্বাস করেন যে খ্রিস্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে না এবং বিশ্বজুড়ে অনেক মুসলিম তাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বাগত জানায়।^[54] ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইস যুক্তি দেন যে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বত এবং ধ্বংসাত্মক ধর্মীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতা বিকশিত হয়েছিল - এমন একটি ব্যাধি যার দ্বারা ইসলাম ভোগেনি।^[55] ইসলামের ইতিহাসে "আঞ্চলিক, উপজাতি এবং বংশীয় যুদ্ধ ...

ধর্মীয় রঙের সাথে", "মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা" যেমন সুন্নি অটোমান সাম্রাজ্য এবং শিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে , কিন্তু ধর্মীয় যুদ্ধ নয়; ^[56] ধর্মীয় বৈষম্য কিন্তু নিপীড়ন নয়, অবিশ্বস্ত ধর্মত্যাগীদের বিচার কিন্তু ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং ধর্মদ্রোহীদের পুড়িয়ে মারা নয়; ^[56] এবং ম্যাথু 22:21 এর মতো কোনও ধর্মগ্রন্থ নেই "যা সিজারের তা সিজারকে দাও, এবং যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও"। ^[55] (লুইস উল্লেখ করে শেষ করেন যে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপের সমস্যাটি ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং "ইহুদি ও মুসলমানরা সম্ভবত একটি খ্রিস্টান রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে এবং তাই তারা একটি খ্রিস্টান প্রতিকার বিবেচনা করতে পারে।" ^[57] বিরোধিতা

ইসলামী পুনরুজ্জীবনবাদীদের কাছ থেকে

১৯৭৮-৯ সালের ইরানি বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হওয়া ইসলাম/ইসলামী পুনরুজ্জীবন ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্বের সমর্থকদের ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। মিশর, আলজেরিয়া এবং তুরস্কের মতো আধুনিকীকরণশীল মুসলিম দেশগুলিতে রাজনীতিতে ইসলামের পুনরুত্থান তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেনি যারা বিশ্বাস করতেন যে ধর্ম জনজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে নয় বরং প্রান্তিক পর্যায়ে থাকা উচিত। অধিকন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি গ্রামীণ নয় বরং একটি শহুরে ঘটনা ছিল এবং এর নেতা এবং সমর্থকরা ছিলেন শিক্ষিত পেশাদার। ^[58] ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিপরীত করার জন্য ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের শক্তির একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ ছিল ইরাকে যেখানে ১৯৯০-১৯৯১ সালে কথিত ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদী বাথ পার্টির নেতা (সাদাম হোসেন), "নিজেকে যুদ্ধে পেয়ে, তার ব্যানারে *আল্লাহ্ আকবর* খোদাই করেছিলেন এবং নবীকে স্বপ্নে দেখার পর, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।" ^[59]

ওয়ালি নসরের মতো পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে মুসলিম বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাতদের উপর ঔপনিবেশিক শক্তি আধিপত্য বজায় রাখার জন্য চাপিয়ে দিয়েছে। ^[60] ইসলামপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতিকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ দ্বারা নির্ধারিত আদর্শিক রাজনৈতিক মূল্যবোধের সাথে মিশেছে। ^[61] যুক্তি দেওয়া হয় যে ঐতিহাসিকভাবে এটিই ঘটেছে এবং রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ধর্মনিরপেক্ষ/আধুনিকতাবাদী প্রচেষ্টা *জাহিলিয়া* (প্রাক-ইসলামিক অজ্ঞতা), *কাফির* (অবিশ্বাস/কুফর), *ইরতিদাদ* (ধর্মত্যাগ) এবং নাস্তিকতা ছাড়া আর

কিছুই নয়। ^[62]^[63] জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদী ১৯৪৮ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা ঈশ্বর এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করছিলেন। ^[64]

রক্ষণশীল মুসলিমদের কাছ থেকে

সৌদি পণ্ডিতরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ইসলামবিরোধী বলে নিন্দা করেন। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের শাসনামলের আগে, সৌদি আরবের ইফতা, প্রচার ও নির্দেশনা অধিদপ্তর একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল যে, যে কেউ বিশ্বাস করে যে নবীর চেয়েও নিখুঁত কোন নির্দেশনা (হুদা) আছে (যেমন হাদিস এবং অন্যান্য সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে), অথবা অন্য কারো শাসন নবীর চেয়ে উত্তম, সে কাফির। ^[65]

এতে বেশ কিছু নির্দিষ্ট নীতির তালিকা দেওয়া হয়েছে যা ইসলামের অনুশাসন থেকে গুরুতর বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং শরিয়া/ইসলামী আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ:

- এই বিশ্বাস যে মানুষের তৈরি আইন এবং সংবিধান শরিয়া/ইসলামী আইনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
- এই মতামত যে ইসলাম কেবল আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং জীবনের দৈনন্দিন বিষয়গুলির সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।
- আধুনিক যুগে হুদুদ(শরিয়া/ইসলামী আইনের আইনি শাস্তি) অসঙ্গত বলে এর প্রয়োগকে অস্বীকার করা।
- আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করে, সে কাফির(অবিশ্বাসী)। ^[66]

তারিক আল-বিশরীর দৃষ্টিতে, "ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলাম একমত হতে পারে না, যদি না তালফিক [মিথ্যাকরণ, অর্থাৎ ইসলামের একাধিক মাযহাবের মতবাদ একত্রিত করা], অথবা প্রতিটি মাযহাবের প্রকৃত অর্থ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়।" ^[67]

মনসুর আলম যুক্তি দেন যে, যেহেতু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করছিল, সেই একই সময়ে অটোমান এবং মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছিল, তাই "মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সাথে সাথে কেবল রাষ্ট্রীয় বিষয়ে গির্জার আনুষ্ঠানিক ভূমিকার অবসানের

জন্যই নয়, বরং মুসলিম শক্তির পতনের জন্যও দায়ী। ... মুসলিম গোঁড়ামি পশ্চিমা রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করেছিল। এটা সুপরিচিত যে সৌদি রক্ষণশীলরা সৌদি আরবে টেলিফোন এবং টেলিভিশন প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।" ^[68]

কর্তৃত্ববাদের সাথে সংযোগের প্রশ্ন

অনেক পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন যে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলি তাদের শাসন (এবং তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা) রক্ষা করার জন্য এবং ইসলামবাদের বিস্তার থেকে আরও দমনমূলক এবং কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে, ^[69] অথবা ইসলামবাদের হুমকিকে আরও কর্তৃত্ববাদী হওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে। কেউ কেউ (ফরিদ জাকারিয়া) যুক্তি দিয়েছেন যে যখন সরকারি দমন অসন্তোষ বৃদ্ধি করে, তখন সরকার যে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে তার প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় - এবং তার ধার্মিক ইসলামপন্থী শত্রুদের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। ^[69]

তুরস্ক এবং আলজেরিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলিতে ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর, "ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার" জন্য সামরিক বাহিনী নির্বাচন বাতিল করে। ^[70] আলজেরিয়ায়, ১৯৯১ সালে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS) এর ব্যাপক বিজয়ের পর একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। FIS সমর্থকরা উঠে দাঁড়ায় এবং রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ^{[71][70]} তুরস্কে, ওয়েলফেয়ার পার্টি ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়, ^[72] কিন্তু ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তুর্কি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় যা "উত্তর-আধুনিক অভ্যুত্থান" নামে পরিচিত। ^[73] সেই হস্তক্ষেপের পরে কোনও গৃহযুদ্ধ হয়নি তবে ওয়েলফেয়ার পার্টির (AKP) একটি পরবর্তী সংস্করণ ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসে এবং কর্তৃত্ববাদ এবং ক্ষমতার পদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষদের নির্মূল করার জন্য পরিচিত হয়ে ওঠে। (নীচে দেখুন)

কিছু দেশে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা দখলের ভয় ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে পরিচালিত করেছে। ^[74] "সিরিয়ার শাসকগোষ্ঠী ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় আসার ভয়কে পুঁজি করে সিরিয়ার মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর ব্যাপক দমন-পীড়নকে ন্যায্যতা দিতে সক্ষম হয়েছিল।" ^[75] আমেরিকান কূটনীতিকরা হোসনি মোবারককে সংবাদমাধ্যমকে আরও

অধিকার দিতে এবং বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার বন্ধ করতে বললে , মোবারক প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, "আমি যদি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে মৌলবাদীরা মিশরের সরকার দখল করবে। আপনি কি তা চান?" ২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন যখন ইয়াসির আরাফাতকে ফিলিস্তিনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বলেন , তখন ইয়াসির আরাফাত একইভাবে উত্তর দেন, দাবি করেন যে "একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামপন্থী হামাস অবশ্যই সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেবে"। ^[69]

ফরিদ জাকারিয়া (২০০৩ সালে লেখা) যুক্তি দেন যে কর্তৃত্ববাদ কম হলে ধর্মনিরপেক্ষতার ইসলামপন্থী শত্রুরা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, তিনি উল্লেখ করেন যে (২০১১ সালের বিপ্লবের আগে) মিশর ইসলামী মৌলবাদীদের সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নিষেধ করেছিল, যদিও সেই সংসদ "সম্পূর্ণ শক্তিহীন" ছিল। যদি তারা (এবং অন্যান্য কর্তৃত্ববাদী মুসলিম দেশগুলি) তা না করত, তাহলে মৌলবাদীরা মুসলিম জনসাধারণের দ্বারা "দূরবর্তী নায়ক হিসেবে দেখা বন্ধ" করত এবং "স্থানীয় রাজনীতিবিদ হিসেবে দেখা হত।" ^[76] ফ্রেড হ্যালিডে এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে রাজনৈতিক বিরোধিতা করার জন্য মসজিদকেই একমাত্র নিরাপদ স্থান করে দিয়েছে। ^[77]

ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদ

১৯৮৮ সালে আজ্জা কারাম ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদীদের বর্ণনা এভাবে দিয়েছিলেন: "ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাদের বক্তব্য মুসলিম বা খ্রিস্টান যে কোনও ধর্মের বাইরে স্থাপন করা উচিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আলোচনার মধ্যে স্থাপন করা উচিত। তারা ধর্মীয় বক্তব্যকে মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত ধারণা এবং ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করে 'তাদের সময় নষ্ট' করেন না। তাদের কাছে, ধর্মকে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে সম্মান করা হয়, তবে নারী মুক্তির বিষয়ে কোনও এজেন্ডা তৈরির ভিত্তি হিসাবে এটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এটি করার মাধ্যমে, তারা ধর্মের সাথে নারীর অবস্থান নিয়ে অন্তর্হীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়া এড়ান।" ^[78] সাধারণত, ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদী কর্মীরা লিঙ্গের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতার আহ্বান জানান, ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে নারীর অধিকার সম্পর্কে তাদের ধারণাগুলিকে ভিত্তি করার চেষ্টা করেন, ইসলামবাদকে তাদের সমতার পথে বাধা এবং পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সংযোগ হিসাবে দেখেন। তারা যুক্তি দেন যে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ^[79]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ

বিশ্বের ৫০টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে, নিম্নলিখিত ২১টি দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

-  আলবেনিয়া [৪০]
-  আজারবাইজান [৪১]
-  বসনিয়া-হার্জেগোভিনা [৪২]
-  বুরকিনা ফাসো [৪৩]
-  চাদ [৪৪]
-  গিনি [৪৫]
-  ইন্দোনেশিয়া [৪৬] [নোট ২]
-  কাজাখস্তান [৪৮]
-  কসোভো [৪৯]
-  কিরগিজস্তান [৯০]
-  মালি [৯১]
-  নাইজার [৯২]
-  নাইজেরিয়া [৯৩] [নোট ৩]
-  উত্তর সাইপ্রাস [৯৪]
-  পাকিস্তান [৯৫]
-  সেনেগাল [৯৬]
-  সিয়েরা লিওন [৯৭]
-  সুদান [৯৮]
-  তাজিকিস্তান [৯৯]
-  তুরস্ক [১০০]
-  তুর্কমেনিস্তান [১০১]
-  উজবেকিস্তান [১০২]

রাষ্ট্র অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন

ক্রিমিয়া (ইউক্রেন)

মূল নিবন্ধগুলি: [ইসমাইল গ্যাসপিরালি](#) এবং [জাদিদ](#)

প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনগুলি রাশিয়ান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিল। একজন ক্রিমিয়ান তাতার বুদ্ধিজীবী [ইসমাইল গ্যাসপ্রিনস্কি](#) ছিলেন পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের প্রথম মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যিনি তুর্কি ও ইসলামী সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর দ্বারা শুরু হওয়া আন্দোলনের নামকরণ করা হয়েছিল *উসুল-ই সেদিদ* যার অর্থ "নতুন আন্দোলন"।

১৯১৭ সালে, [ক্রিমিয়ান তাতাররা](#) তাদের স্বাধীনতা ([ক্রিমিয়ান গণপ্রজাতন্ত্র](#)) ঘোষণা করে, যা ছিল আধুনিক মুসলিম বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যেখানে [নারীদের ভোটাধিকার](#) প্রবর্তন করা হয়েছিল। ^[103]

তুরস্ক

মূল নিবন্ধ: [তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা](#)

[তুরস্কে](#) ধর্মনিরপেক্ষতা নাটকীয় এবং সুদূরপ্রসারী ছিল কারণ এটি [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের](#) পর [অটোমান সাম্রাজ্যের](#) পতনের শূন্যস্থান পূরণ করেছিল। ১৯২৮ সালে রাষ্ট্রধর্মকে বাদ দিয়ে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শুরু করে, [মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক](#) একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। "আনুষ্ঠানিক তুর্কি আধুনিকতা মূলত ইসলামী অটোমান ব্যবস্থার অস্বীকার এবং পশ্চিমা-ভিত্তিক আধুনিকীকরণ পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে রূপ নেয়।" ^[104]

- খেলাফত বিলুপ্ত করা হয়েছিল।
- ধর্মীয় লজ এবং সুফি সম্প্রদায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
- [সুইস সিভিল কোডের উপর ভিত্তি করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সিভিল কোড গৃহীত হয়েছিল যা ইসলামী আইন \(শরিয়ত\)](#) ভিত্তিক পূর্ববর্তী কোডগুলিকে প্রতিস্থাপন করে সকল ধরনের বহুবিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করে, ধর্মীয় বিবাহ বাতিল করে, উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করে।
- ধর্মীয় আদালত ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত করা হয়েছিল।
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
- জনগণের ধর্মীয় বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল।

- বর্ণমালা আরবি থেকে ল্যাটিনে পরিবর্তন করা হয়েছিল।
- ধর্মীয় কার্যকলাপের একটি অংশ তুর্কি ভাষায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, যার মধ্যে আযান (এজান, প্রার্থনার আযান) অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বর্তমানে, তুর্কি ভাষায় কেবল খুতবা (খুতবা, হতবে) রয়েছে।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইসলামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, রাজনৈতিক ইসলামপন্থী এবং ওয়েলফেয়ার পার্টি এবং জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (AKP) এর মতো ইসলামপন্থী গণতন্ত্রীরা প্রভাব বিস্তার করে। ২০০২ সালের নির্বাচনে AKP ক্ষমতায় আসে এবং (২০২৪ সাল পর্যন্ত) ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতিতে এটি ধরে রাখে; ^[105]^[106] "পুরাতন ধর্মনিরপেক্ষ রক্ষীদের" কর্তৃত্বের পদ থেকে অপসারণ করে তাদের স্থলে AKP-এর সদস্য/সমর্থকদের নিয়োগ করা; ^[107] "একটি ধর্মপ্রাণ প্রজন্ম গড়ে তোলার" জন্য শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করা সরকারি নীতিতে পরিণত হয়; ^[108]^[109] ধর্মীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ এবং সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থার ভূমিকা উল্টে দেওয়া (Dianet), ইসলামের একটি রক্ষণশীল (হানাফিসুন্নি) সংস্করণ প্রচার করা। ^[110]

লেবানন

মূল নিবন্ধ: লেবাননে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন

লেবানন হল একটি সংসদীয় গণতন্ত্র যা স্বীকারোক্তিবাদের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত, যা সাম্যবাদের একটি রূপ যেখানে সর্বোচ্চ পদগুলি আনুপাতিকভাবে নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত। তবে, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লেবাননী স্বীকারোক্তিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে, জাতীয় সরকারে লাইসিটি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ওকালতি করছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার সাম্প্রতিকতম প্রকাশ ছিল ২৬শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে বৈরুতে হিবুত তাহরীরের ক্রমবর্ধমান আবেদন এবং ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বৈরুতে অনুষ্ঠিত লাইক প্রাইড মার্চ।

তিউনিসিয়া

মূল নিবন্ধ: তিউনিসিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা

হাবিব বোরগুইবার নেতৃত্বে (১৯৫৬-১৯৮৭), তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার ধর্মনিরপেক্ষকরণের একটি কর্মসূচি অনুসরণ করে। ^[111]

বোরগুইবা হাবুস (ধর্মীয় দান) সম্পর্কিত আইন সংশোধন করেন, শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করেন এবং আইনি ব্যবস্থাকে একীভূত করেন যাতে ধর্ম নির্বিশেষে সকল তিউনিসিয়ান রাষ্ট্রীয় আদালতের অধীন হন। তিনি ইজ-জিতুনা ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব সীমিত করেন এবং এটিকে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একীভূত ধর্মতত্ত্ব অনুষদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন,

মহিলাদের জন্য হিজাব নিষিদ্ধ করেন, ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী করেন এবং মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং প্রচারকদের বেতন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেন।^[112]

অধিকন্তু, তার সবচেয়ে পরিচিত আইনি উদ্ভাবন ছিল 'কোড ডু স্ট্যাটুট পার্সোনেল' (সিএসপি), যা পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে: বিবাহ, শিশুদের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে বহুবিবাহ বিলুপ্ত করা এবং বিবাহবিচ্ছেদকে বিচারিক পর্যালোচনার বিষয় করে তোলা।^[113]

বোরগুইবা স্পষ্টতই ^[উদ্ধৃতি প্রয়োজন] তার ধর্মনিরপেক্ষকরণ কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন, এবং যদিও তিনি ইসলামের আধুনিকতাবাদী পাঠের কাঠামোর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করার জন্য সতর্ক ছিলেন এবং এগুলিকে ইজতিহাদের (স্বাধীন ব্যাখ্যা) ফসল হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন এবং ইসলামের সাথে বিরতি নয়, তবুও তিনি তার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। জন এসপোসিতো বলেছেন যে "বোরগুইবার কাছে, ইসলাম অতীতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল; পশ্চিমা বিশ্ব ছিল তিউনিসিয়ার আধুনিক ভবিষ্যতের একমাত্র আশা।"^[114]

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যার পর, ১৯৭০ সালে ইজ-জিতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং সিরিয়ান ও মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো আরব ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবের মাধ্যমে ইসলামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।^[115] হিযবুত-তাহরিরেরও প্রভাব রয়েছে, যার সদস্যরা তিউনিসে আজিতুনা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।^[116] পরবর্তীকালে, বোরগিবা এবং ইসলামপন্থীদের মধ্যে সংগ্রাম অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে এবং বিরোধী দলকে দমন করার জন্য ইসলামপন্থী নেতৃত্বকে নির্বাসিত, গ্রেপ্তার এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।^[117]

এল্লাহদা আন্দোলন, যা রেনেসাঁ পার্টি বা কেবল এল্লাহদা নামেও পরিচিত, তিউনিসিয়ার একটি মধ্যপন্থী ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল।^{[118][119][120][121]} ২০১১ সালের তিউনিসিয়ার বিপ্লবের পর জাইন এল আবিদিন বেন আলীর ধর্মনিরপেক্ষ একনায়কতন্ত্রের পতনের পর, ১ মার্চ ২০১১ তারিখে, তিউনিসিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই দলটিকে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেয়। তারপর থেকে এটি তিউনিসিয়ার সবচেয়ে বড় এবং সুসংগঠিত দল হয়ে উঠেছে, এখন পর্যন্ত তার ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিযোগীদের ছাড়িয়ে গেছে। ২০১১ সালের তিউনিসিয়ার গণপরিষদ নির্বাচনে, যা দেশের ইতিহাসের প্রথম সং নির্বাচন, যেখানে ৫১.১% যোগ্য ভোটার ভোট পেয়েছিলেন, দলটি ৩৭.০৪% জনপ্রিয় ভোট এবং ২১৭টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮৯ (৪১%) জয়লাভ করে, যা অন্য যেকোনো দলের চেয়ে অনেক বেশি।^{[122][123][124][125][126]}

মিশর

মূল নিবন্ধ: মিশরে ধর্মনিরপেক্ষতা

মিশরের ইতিহাস এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে মিশরে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম অভিজ্ঞতা শুরু হয় ব্রিটিশ দখলদারিত্বের (১৮৮২-১৯৫২) মাধ্যমে, যে পরিবেশে পশ্চিমা ধারণার প্রচার সম্ভব হয়েছিল। এই পরিবেশে, ইয়াকুব সররুফ, ফারিস নিমর, নিকোলা হাদাদ-এর মতো ধর্মনিরপেক্ষপন্থী বুদ্ধিজীবীরা যারা অটোমান শাসন থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন, তাদের কাজ প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই বিতর্ক তখন মিশরীয় শায়খ আলী আবদ আল-রাজিকের (১৮৮৮-১৯৬৬) কাজের সাথে একটি জ্বলন্ত বিষয় হয়ে ওঠে, "আধুনিক ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল" ^[62]

১৯১৯ সালের মধ্যে, মিশরের প্রথম রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা হিব্বুত আলমানি (ধর্মনিরপেক্ষ দল) নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তন করে ওয়াফদ দল রাখা হয়। এটি ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলিকে জাতীয়তাবাদী এজেন্ডার সাথে একত্রিত করে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে রাজার শাসন এবং ব্রিটিশ প্রভাব উভয়ের বিরুদ্ধেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জন করে। ওয়াফদ দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রদের সমর্থন করে এবং তারপর ১৯৫২ সালের সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে, এই নির্বাচনের পর রাজা প্রধানমন্ত্রীকে উৎখাত করেন যার ফলে দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গার ফলে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যার পরে ওয়াফদ এবং মুসলিম ব্রাদারহুড সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। ^[62] গামেল আবদেল নাসেরের সরকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ-জাতীয়তাবাদী প্রকৃতির, যা সেই সময়ে মিশর এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর সমর্থন অর্জন করেছিল। নাসেরবাদের মূল উপাদান : ^[127]

- ধর্মনিরপেক্ষ-জাতীয়তাবাদী একনায়কতন্ত্র: কোনও ধর্মীয় বা অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবে না।
- আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন এবং জাতীয়করণ; সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
- মুসলিম মূল্যবোধ, পরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের চেয়ে আরব মূল্যবোধ, পরিচয় এবং জাতীয়তাবাদের উপর মনোনিবেশ।

নাসেরের প্রশাসনের ধর্মনিরপেক্ষ উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে আনোয়ার সাদাত এবং হোসনি মুবারকের সময়কালকে প্রভাবিত করেছিল এবং ২০১১ সালের মিশরীয় বিপ্লব পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষরা মিশর শাসন করেছিল। তা সত্ত্বেও, মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুড ইসলামী বিশ্বের, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। বহু বছর ধরে এটিকে "আধা-আইনি" ^[128] হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং

নির্বাচনের সময় প্রার্থী দিতে সক্ষম মিশরের একমাত্র বিরোধী দল ছিল।^[129] ২০১১-১২ সালের মিশরীয় সংসদীয় নির্বাচনে, "ইসলামবাদী" হিসাবে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলগুলি (ব্রাদারহুডের ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি, সালাফি আল-নূর পার্টি এবং উদার ইসলামপন্থী আল-ওয়াসাত পার্টি) মোট আসনের ৭৫% জিতেছিল।^[130] মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন ইসলামপন্থী গণতন্ত্রী মোহাম্মদ মুরসি ছিলেন মিশরের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। আজকাল, ধর্মনিরপেক্ষতার বেশিরভাগ মিশরীয় সমর্থক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কপটিক খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে 'জাতীয় ঐক্য'র মধ্যে সংযোগের উপর জোর দেন।

সিরিয়া

মূল নিবন্ধ: [সিরিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা](#)

সিরিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষকরণের প্রক্রিয়া ১৯২০-এর দশকে ফরাসি ম্যান্ডেটের অধীনে শুরু হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের অধীনে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ১৯৬৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সিরিয়া আরব জাতীয়তাবাদী বাথ পার্টি দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাথ সরকার আরব সমাজতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ এবং একটি কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে একত্রিত করেছে। সংবিধান প্রতিটি স্বীকৃত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়, যার মধ্যে অনেক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও রয়েছে। সমস্ত স্কুল সরকার-পরিচালিত এবং অ-সাম্প্রদায়িক, যদিও ইসলাম এবং/অথবা খ্রিস্টধর্মে বাধ্যতামূলক ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইসলামের রাজনৈতিক রূপ সরকার দ্বারা সহ্য করা হয় না। সিরিয়ার আইনি ব্যবস্থা মূলত নাগরিক আইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং ফরাসি শাসনের সময়কাল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এটি আংশিকভাবে আবদেল নাসেরের মিশরীয় আইন থেকেও নেওয়া হয়েছে, যা অটোমান মিলেট ব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুটা এবং শরিয়া থেকে খুব কম। সিরিয়ায় পৃথক ধর্মনিরপেক্ষ এবং ধর্মীয় আদালত রয়েছে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলাগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আদালতে শুনানি করা হয়, যখন শরিয়া আদালতগুলি মুসলিমদের মধ্যে বা মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলি পরিচালনা করে।^[131] অমুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় আইন ব্যবহার করে নিজস্ব ধর্মীয় আদালত রয়েছে।^[132]

ইরান

মূল নিবন্ধ: [ইরানে ধর্মনিরপেক্ষতা](#)

১৯২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সামরিক অভ্যুত্থানের পর, রেজা খান দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে

এই ভয়ে, ইরানের ধর্মযাজকরা তাদের সমর্থনের প্রস্তাব দেন এবং তাকে শাহের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি করান। ^[133]

১৯২৫-১৯৪১ : রেজা শাহ ইরানি সমাজে কিছু নাটকীয় পরিবর্তন আনতে শুরু করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্যকরণ এবং জনসাধারণের ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে সরিয়ে ফেলা। তিনি ধর্মীয় স্কুলগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলে রূপান্তরিত করেন, ইরানের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন এবং জনসমক্ষে হিজাব নিষিদ্ধ করেন। তবুও, মজলেস ক্ষমতা (১৯০৬ সালে প্রথম সংসদ) অপসারণ এবং বাকস্বাধীনতার উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক এবং কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে। ^[134]

১৯৫১-১৯৫৩ : ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে, প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেগ আবারও সমাজতান্ত্রিক এজেন্ডা নিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করছিলেন যার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ধর্মযাজকদের ক্ষমতা হ্রাস করা। তবে, অ্যাংলো-ইরানিয়ান তেল কোম্পানি (পরবর্তীতে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) কর্তৃক অধিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক তেল স্বার্থ জাতীয়করণের তার পরিকল্পনা যুক্তরাজ্যের ক্রোধের কারণ হয়েছিল। প্রতিক্রিয়ায়, সিআইএ-এর সহায়তায় যুক্তরাজ্য একটি অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে যা মোসাদ্দেককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় এবং মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে পুনর্বহাল করে।

১৯৬২-১৯৬৩ : পশ্চিমাকরণের ম্যাভেট ব্যবহার করে, মোহাম্মদ রেজা পাহলভি শ্বেত বিপ্লব প্রবর্তন করেন , যার লক্ষ্য ছিল ইরানকে একটি পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তরিত করা।

১৯৬৩-১৯৮০ : আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির পিছনে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং দশকের শেষের দিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবে শাহকে উৎখাত করা হয়। ^[১৩৪] দেশটি একটি কর্তৃত্ববাদী ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় যা আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

পাকিস্তান

মূল নিবন্ধ: পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতা

- সাদিক আল-আজম
- প্রগতিশীল ব্রিটিশ মুসলিমরা
- ইসলামের মধ্যে উদারনীতি এবং প্রগতিবাদ
- তোলু-ই-ইসলাম
- ইসলামী রাষ্ট্র
- খিলাফত

গ্রন্থপঞ্জি

- আদি, এল. (২০২১)। মুসলিম ধর্মীয় আলোচনার সংকট: প্লেটো থেকে কান্টে প্রয়োজনীয় স্থানান্তর (প্রথম সংস্করণ)। রাউটলেজ।

<https://doi.org/10.4324/9781003227076>

তথ্যসূত্র

মন্তব্য

যদিও [বার্নার্ড লুইস](#) বা [মনসুর আলম](#) কেউই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বর্ণনা করার জন্য "কঠিন" এবং "নরম" শব্দ ব্যবহার করেন না, উভয়ই কমিউনিজমের ধর্মীয় নীতিগুলিকে পশ্চিমা দেশগুলির গির্জা-এবং-রাষ্ট্র-বিচ্ছিন্নতা ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে পৃথক বলে উল্লেখ করে।

- লুইস দুই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতার বর্ণনা দিয়েছেন:
 - মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা: "এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষতা বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে বিকশিত হয়েছিল, যদিও এর সমর্থকরা অন্যত্র রয়েছে ... এর অনুসারীরা নাস্তিক, কিন্তু ঈশ্বরহীন নয়। ... তাদের কোন ধর্ম নেই, তবে তাদের অবশ্যই একটি গির্জা আছে, যেখানে ধর্মগ্রন্থ এবং মতবাদ, প্রিলেট এবং উত্তরাধিকারী, গোঁড়ামি, ধর্মবিরোধী মতবাদ এবং তাদের সনাক্ত এবং নির্মূল করার জন্য একটি তদন্ত রয়েছে ..."
 - ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতা: "সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে যে ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছিল এবং আমেরিকান এবং অন্যভাবে, আঠারো শতকে ফরাসি বিপ্লব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল একেবারেই ভিন্ন ধরনের। এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োগ করা নয়, বরং রাষ্ট্রকে মতবাদে যেকোনো সম্পৃক্ততা থেকে বিরত রাখা এবং যেকোনো মতবাদের সমর্থকদের রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা ব্যবহার থেকে বিরত রাখা"। ^[17]
- [মনসুর আলম](#) কমিউনিজম/মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ধর্মনিরপেক্ষতার এক প্রকার হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করেন না, কেবল এমন কিছু যা অজ্ঞ মুসলিম পণ্ডিতরা প্রকৃত (অর্থাৎ নরম) ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। বাস্তবে "... বিভিন্ন ধর্ম এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য না করার [একটি] মনোভাব হল ধর্মনিরপেক্ষতার সারমর্ম এবং মূল বিষয়। তবুও, সাধারণভাবে [উলেমারা](#) এবং বিশেষ করে [পাকিস্তানি উলেমারা](#) এই ধারণার প্রতি এতটাই বিদ্বেষ বোধ করেন যে তারা পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে এই শব্দটির উল্লেখের সাথে সাথে রাস্তায় নেমে সহিংসতা

ব্যবহার করার হুমকি দেন। বাস্তবতা হল তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে কমিউনিজমের সাথে গুলিয়ে ফেলেন।" ^[18]

- জাকির আল ফারুকী এবং মো. রোকনুজ্জামান সিদ্দিকী কঠোর এবং নরম ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কথা বলেন, কিন্তু মূলত তারা মুসলিম বিশ্বের "ধর্মনিরপেক্ষতার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি" সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন: "(i) উগ্রপন্থী বা চরমপন্থী" এবং "(ii) মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী"। উগ্রপন্থী বা চরমপন্থী ধরনের কমিউনিজম নয়, যা তারা উপেক্ষা করে, বরং কামাল আতাতুর্কের তুর্কি ধর্মনিরপেক্ষতা।

- মৌলবাদীরা বিশ্বাস করে যে "ধর্ম আধুনিকীকরণ, উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের জন্য প্রধান বাধা" এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনে এটি অনুমোদিত হওয়া উচিত। এই পদ্ধতিটি কামাল আতাতুর্ক গ্রহণ করেছিলেন, তবে মিশরের জামাল আবদেল নাসের (১৯১৮-১৯৭০), ইরাকের সাদ্দাম হোসেন (১৯৩৭-২০০৬), ইরানের রেজা শাহ পাহলভি (১৮৭৮-১৯৪৪) এবং সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদ (১৯৩০-২০০০), আজারবাইজানের ইসলাম করিমভ (১৯৩৮-২০১৬)ও গ্রহণ করেছিলেন।
- মধ্যপন্থী বা উদার ধর্মনিরপেক্ষতা বহুত্ববাদ, ধর্মীয় পার্থক্যের প্রতি সহনশীলতা এবং সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে। ^[19] সমর্থকরা যুক্তি দেন যে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এই পৃথকীকরণ ইসলামী ইতিহাস জুড়ে অনুশীলন করা হয়েছে। ^[20]

ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে শরিয়া আইনের বিধান রয়েছে যা এর মুসলিম বাসিন্দাদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য।

^[87]

নাইজেরিয়ার ১২টি উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যপূর্ণ শরিয়া আইন প্রয়োগ করে।

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার নিয়মিত আয়োজন 'মাসিক মুহাযারা'র অংশ হিসেবে কিছুদিন আগে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' নিয়ে আলোচনা করেছেন মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুল্হুম। তার আলোচনাটি পত্রস্থ করেছেন মাওলানা আনোয়ার হুসাইন। পরবর্তীতে এটি মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ দামাত বারাকাতুল্হুম-এর কিছু সংযোজন ও বিয়োজনের পর আলকাউসারের পাঠকের জন্য প্রকাশ করা হল।-
তত্ত্বাবধায়ক

শুধু সচেতন আলেমে দ্বীন হিসেবেই নয়, স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হিসেবেও এ বিষয়টি আমাদের বোঝা উচিত। কারণ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের মৌলিক চার নীতির মধ্যে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’কে স্থান দেওয়া হয়েছে। এরপর সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে এ নীতিটি বাদ দিয়ে তার স্থলে আনা হয়েছে ‘মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’। কিন্তু তিন দশক পর আবারো বর্তমান সরকার ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ সংবিধানে ফিরিয়ে এনেছে এবং ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে “মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস”-এর নীতিটি।

সংবিধান জনগণকে প্রজাতন্ত্র তথা দেশের মালিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সে হিসেবে রাষ্ট্রের মালিক তথা নাগরিকদের জন্য দেশের সংবিধান জানার ও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের নামে জনপ্রতিনিধি তথা সংসদসদস্যগণ কী কী বিষয় সংবিধানে যোগ-বিয়োগ করছেন তার প্রতি নজর রাখা সচেতন নাগরিকদের কর্তব্যও বটে। আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই।

ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা/পরিচয়

প্রথমেই বলা দরকার যে, কিছু জিনিস আছে যেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া লাগে না। এমনিই বুঝে আসে। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটিও এমন। কম পড়ুয়া লোকজনও এর অর্থ বুঝে নিতে পারবে। ইংরেজি Secularism শব্দের বাংলারূপ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, আরবীতে যাকে বলা হয় ‘আল আলমানিয়াহ’।

প্রথমেই দেখুন বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী। ২০১২ সালের এ সংস্করণ ছেপেছে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের সম্পাদনায়। Secular-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা, জড়, জাগতিক।

Secular State ‘গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র’। এ অর্থ অনুযায়ী মুসলিম দেশে এর ব্যাখ্যা হবে মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র।

Secularism নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়-এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ।

এ অর্থগুলো লিখেছে বাংলা একাডেমীর অভিধান। এটির সম্পাদনায় কোনো ডানপন্থী বা কোনো ‘হুজুর’ জড়িত ছিলেন না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক।

এটা এমন নয় যে, কোনো মতবাদ ওয়ালারা নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ব্যাখ্যা লিখেছে; বরং দেশের সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, যারা সংবিধানে আবার সেকুলারিজমকে স্থান দিয়েছে তাদের কর্তৃক নিয়োজিত, নির্ভরযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিরাই সেকুলারিজমের এই অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আমার দেখে ভালো লেগেছে যে, ওনারাও ভালো মানুষ। রাখঢাক না করে সাফ সাফ কথাটাই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়’-এমন কথা লেখেননি। আমি বাইরের অভিধানেও খোঁজ করেছি। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা দেখেছি, উইকিপিডিয়া দেখেছি। একই ব্যাখ্যা পেয়েছি। অক্সফোর্ড ইংরেজী-উর্দু ডিকশনারী। সেখানে লেখা আছে, Secularism لا دينية لا مذهبية (ধর্মহীনতা)।

এগুলো মুসলমানদের ব্যাখ্যা নয়। সেকুলারিজম যে বাস্তবেই لا دينية لا مذهبية (ধর্মহীনতা) এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না। বাংলা একাডেমীরটা তো দেখলেনই। উইকিপিডিয়াতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা করা হয়েছে Anti Islam দিয়ে।

তাই বলছিলাম অনেক কিছুই আছে যেগুলো ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর দরকার হয় না। শব্দ দেখেই মতলব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিল ১৯৭২ সালে। সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের মূলনীতিতে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জনগণ তখন জেনেছে এই রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য স্বাধীন হয়েছে। বিজয়ের এক বছর পর ১৯৭২ সালের শেষের দিকে সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। বস্তুত তখনই দেশের সাধারণ জনগণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা জেনেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক, অল্প ধার্মিক হোক বা বেশি ধার্মিক যুদ্ধের সময় তারা জানেনি যে, তারা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য যুদ্ধ করছেন। এটা জেনেছেন তারা ১৯৭২ এর শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধেরও আরো এক বছর পরে। কারণ সংবিধানে এই কথা লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে সব কারণে আমাদের দেশের আবাল, বৃদ্ধ, নওজোয়ানরা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা সংবিধানে লেখা আছে।

এর আগ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হয়েছে। কোনো ঐতিহাসিক দলিলে সেটা নেই। আপনি আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলো, পৌরনীতির বইগুলো পড়লে এর যথার্থতা খুঁজে পাবেন। এছাড়া স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব

পাকিস্তানী জনগণ বহু আন্দোলন করেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন হয়েছে। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ হয়েছে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে। এগুলোর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার নাম-গন্ধও ছিল না। এমনকি আপনি বর্তমান সময়ের (যখন দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়) মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পাবেন না। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলা যায় যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত নিম্নলিখিত বাক্যটি বাস্তবসম্মত নয়।

“আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ... ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।”

সম্ভবত এ কারণেই স্বাধীনতার ঘোষণাকারী মতান্তরে ঘোষণা পাঠকারী জেডফোর্সের কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান প্রথম সুযোগেই এটিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং পরবর্তীতে অনেক সেক্টর কমান্ডারকেই জনগণ ধার্মিকরূপে পেয়েছে।

সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিদায়

শেখ মুজিব সরকারের সময়েই সংবিধানে ৪টা সংশোধনী হয়ে গিয়েছিল। এরপর জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আইন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে দেন এবং তার স্থলে ‘মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাক্য স্থাপন করেন। দুই যুগেরও বেশি সময় পর্যন্ত সংবিধানে এ বাক্যটি ছিল। এমনকি ১৯৯৬-২০০১ সময়ের আওয়ামী লীগ আমলেও।

‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাদ গেল, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ আবার এল

এরপর হঠাৎ একদিন দেশের ধর্মপ্রাণ নাগরিকগণ অবাক বিস্ময়ে শুনলেন যে, তাদের সংবিধান থেকে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাদ দিয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং এ কাজটি করেছেন দেশের উচ্চ আদালত। যদিও আদালতের রায় প্রকাশ করতে গিয়ে মিডিয়াগুলো বলেছে, ৫ম সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে। আসলে বিষয়টি তেমন নয়। বরং ৫ম সংশোধনীর অনেক কিছুই আদালত বহাল রেখেছেন। বাছাই করে করে কিছু জিনিস বাতিল করেছে আর কিছু জিনিস আগের মতোই রেখে দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের আদালত এ কাজটি করেছে স্বউদ্যোগী হয়ে। তার কাছে কেউ এ ব্যাপারে আবেদন বা মামলা করেনি। বরং একটি সিনেমা হলের মালিকানা সংক্রান্ত মামলার রায় দিতে গিয়ে তিনি কাজটি করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনেছেন।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরপরই বর্তমান সরকার সে অনুযায়ী সংবিধান মুদ্রণ করে এবং এরপর ১৫তম সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরায় স্থান করে দেয়। এভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দেশের একশ্রেণীর ধর্মবিদ্বেষী শ্রেণী, ধর্মবিরোধী গণমাধ্যমগুলো। আর উপেক্ষিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা। ... আমাদেরকে ইতিহাস জানতে হবে, মনে রাখতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে। কে কোন কাজটি কোন মতলবে করছে তা বুঝতে হবে। আজকে আমার মূল আলোচ্য বিষয় সেটি নয়। আমি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে দুচারটা কথা বলব।

ধর্মনিরপেক্ষতাটা বেশি দিন আগের পরিভাষা নয়। অনেক আগ থেকে তা শুরু হয়েছে এমন নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরের ঘটনা এগুলো। বিপ্লবটা ১৭৮০/১৭৯০এর দিকের অর্থাৎ ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইসলামী খেলাফতের পতনের পরের ঘটনা।

ইসলামী খেলাফত শেষ হওয়ার পর মুসলমানরা এসবের সম্মুখীন হয়েছে। আর পশ্চিমা বিশ্ব যখন তাদের পার্থিব উন্নতি ও মনোরঞ্জন পথে কিছু কিছু জায়গায় চার্চগুলোতে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে তাদের বিরোধী মনে করেছে তখন থেকে এ ধরনের চিন্তা কারো কারো মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রসার ঘটেছে।

সেকুলারিজম মুসলমানদের মধ্যে

মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মুস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১৯৩৮)। ১৯ শতকের শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

মুসলমানদের সর্বশেষ দারুল খিলাফা তুরস্কে বসে ঐ লোকটি এ কাজ করেছিল। তার ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৩-১৯৩৮ পর্যন্ত। তখনকার সময়ে সেকুলারিজমটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ঐ ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে পুঁজি করে কত কি সংঘটিত করেছে তা ভাবলেও গা শিউরে উঠে। সে বিষয়ে একটু পরে আরো কিছু কথা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা ইবনে খালদুন সিয়াসাতকে তিন ভাগ করেছেন

১। সিয়াসাতে তাবয়ী (السياسة الطبيعية) সেটা হল فوضى অর্থাৎ যার যার মন মতে চলবে কেউ কারো কর্তৃত্ব মানবে না।

২। (السياسة الملكية) অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থাপনা থাকবে যে অনুযায়ী মানুষ জাগতিক বিষয়গুলো একটি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করবে। বর্তমানের ধর্মনিরপেক্ষতা তেমনি একটি নীতি।

৩। আলখিলাফাহ যেটা মানুষের পার্থিব-অপার্থিব ও ইহ-পরলৌকিক উভয় কল্যাণ নিশ্চিত করে। এরকম একটা নেয়ামের নাম খিলাফত।

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা দুই ধরনের।

১. ধর্মবিদ্বেষী ও ধর্মদ্রোহী লোকজন। অনেক কটর বামপন্থী এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

২. আরেক শ্রেণী আছে যারা জায়গা বুঝে কথা বলে। আত্মরক্ষার জন্য যারা ভদ্র সাজে। ভদ্র বলতে যারা একটু রাখঢাক করতে চায়। এরা বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা নয়। এরা ধর্মনিরপেক্ষতাও রাখবে আবার ধর্ম ওয়ালাদের নারাজও করবে না। এদের উদাহরণ হল।

رحمن بھی راضی رہے اور شیطان بھی بے زار نہ ہو۔

আল্লাহও রাজি থাকুক, কিন্তু শয়তানও অসন্তুষ্ট না হোক।

এরা মানুষকে বলে বেড়ায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না; ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার ইত্যাদি। এ লোকগুলো একদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল সংজ্ঞাকে গোপন করে, অন্যদিকে নিজেদের আসল মতলবকে গোপন রেখে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মবিরোধী উভয় গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতা নাকি ধর্মহীনতা নয়। কার কথাটা ঠিক? ধর্মনিরপেক্ষদের দেখলাম যে, তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। এটা তো এই দেশীয় বক্তব্য। অথচ সেক্যুলারিজম তো এদেশে শুরু হয়নি। এ দেশের আগেই এ নীতি প্রচার পেয়েছে। আমরা পড়া-শোনা কম করি তাই অন্যরা আমাদেরকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত দু'টি পক্ষই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাখতে বদ্ধপরিকর। অথচ যে দুই যুগের বেশি সময় সংবিধানে এ জিনিসটি ছিল না তখন কি এদেশে শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থান ছিল না। ঐ সময়ের মধ্যে তো আওয়ামী লীগও ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা কি দেশে ধর্মীয় সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কোনো সমস্যায় পড়েছিল। দুটির উত্তরই 'না'। তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে ফিরিয়ে আনার পিছনে নিশ্চয়ই আরো অনেক উদ্দেশ্য লুকায়িত, যা বুঝতে হলে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে, মুসলমানদের খেলাফত পরবর্তী অবস্থার দিকে। চোখ ফেরাতে হবে একসময়ের তুরস্ক, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ায়।

আমি আগেই বলেছি যে, আদালতে ৫ম সংশোধনী বাতিল হয়েছে বলা হলেও আসলে এর অনেক কিছুই বাতিল হয়নি। এমনকি অনেক মৌলিক বিষয়ও নয়, যেমন ৫ম সংশোধনী দ্বারা ৪র্থ সংশোধনীকে বাতিল করা হয়েছিল। তৎকালীন মুজিব সরকার ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক দল বানিয়েছিল। সেটা হল বাকশাল। আর সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে সরকার নিজের মালিকানায় চারটি পত্রিকা চালু রেখেছে। রাজনৈতিক দল বা জনগণ ছাড়াও সরকারী কর্মকর্তাদেরও আবশ্যিকভাবে বাকশালে যোগ দেয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীতে ঐ সব বাতিল করে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্র এনেছেন এবং সংবাদপত্রের

স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সম্মানিত আদালত যখন ৫ম সংশোধনী বাতিল করেন তখন তিনি এ অংশটুকু বহাল রেখে দিয়েছেন।

যদি পুরো ৫ম সংশোধনী বাতিল করা হত তাহলে ৪র্থ সংশোধনী ফিরে আসত এবং দেশে পুনরায় একদলীয় বাকশালি শাসন চালু হত। মানুষ হরতাল, অবরোধ থেকে রেহাই পেত আর বর্তমান সরকারী দল অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়ে দ্রুত দেশকে উন্নত করে ফেলতে পারত। নির্বাচন কমিশনকে বদনাম হতে হত না বিরোধী দলবিহীন ৫ জানুয়ারির নির্বাচন করে। যাহোক, ঐ সংশোধনী বাতিলের অন্যতম উদ্দেশ্যই হয়তো ছিল ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে’র স্থলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বসানো।

প্রসঙ্গের টানে আরেকটি কথা বলি, ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তর সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়ায় রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে ‘সমাজতন্ত্র’ও ফিরে এসেছে। কিন্তু সকলেই জানে যে, বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্র। বাহাত্তর সালে সংবিধানে যখন সমাজতন্ত্র ছিল তখন তো বিশ্বের বড় বড় দুটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র চালু ছিল, এখন সেগুলো ধনতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য। অথচ আমরা এখন ফিরিয়ে এনেছি ‘সমাজতন্ত্র’। কিন্তু চলছি পুঁজিবাদী নীতিতে। এটা নিয়ে কোন বিশ্লেষণ নেই, ঝগড়া-ঝাটিও নেই। সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর কয়েকজন তো এখন জোট সরকারেই আছে, মন্ত্রীও আছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান এখন মন্ত্রী। মেনন সাহেবরাও মন্ত্রী। জাসদের সেক্রেটারী সংসদ সদস্য। মেনন সাহেব, বাদল সাহেব, ইনু সাহেবরা কি কখনো সংসদে এ কথা উঠিয়েছেন যে, সংবিধানে এখন তো সমাজতন্ত্র আছে। সুতরাং দেশের পুরো অর্থনীতি সমাজতন্ত্র অনুযায়ী হতে হবে। খোদ আওয়ামী মন্ত্রী বা নেতাদের মধ্যেও সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট মানসিকতার যারা আছেন তারাও তো এমন কথা বলেননি। তেমনি বাইরের বড় বড় বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ যারা তারাও তো সরকারের কাছে এই দাবি তোলেননি। কেন? কেউ তো আদালতে রিটই করে দিতে পারত? সংবিধানের মৌলিক নীতি হল সমাজতন্ত্র তোমরা চলছ ক্যাপিটালিজমে, অর্থাৎ ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদী নীতিতে।

এত মোক্ষম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা কেন এই দাবি উঠায় না। এর চেয়ে বড় মোক্ষম সুযোগ আর কোথায়? আসলে না আদালতের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে, না তাদের। তারা বরং ধর্মনিরপেক্ষতা পেয়েই আপাতত অন্য বিষয়ে ছাড় দিতে প্রস্তুত। আসল বিষয় হল সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের শুরুতে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বড়ই বেমানান। আর ধর্মনিরপেক্ষতাটা রাখা অনেক কিছুর জন্যই প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনেই সংবিধানের সংশোধনী এসেছে।

‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ নীতিকে ছুঁড়ে ফেলে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ প্রতিস্থাপন। না হয় আদালত যখন বাছাই করে করেই বাতিল করলেন ও রাখলেন তখন তিনি এ অংশটুকুও তো রেখে দিতে পারতেন।

ওটা বসালে লাভ কী?

আমাকে কেউ বলেছিল, মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে থেকেই বা লাভ কী? সংবিধানে তো ইসলাম বিরোধী অনেক কিছুই আছে। দেশে তো আর ইসলামী হুকুমত নেই, কখনো ছিলও না। তাহলে অতটুকু কথা বাদ দিলেই বা কী এসে যায়? আপনি কেন এর বিরোধিতা করছেন? আমি বলি, ঠিক যে কারণে ওরা সংবিধান থেকে বিষয়টি তুলে দিতে চায়। মহান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যদি কোনো কাজেই না আসত তাহলে কেন তারা এটি সরিয়ে দিতে চায়? ওটা সরিয়ে দেওয়ার কারণে কি কোনো বদনাম হতে হচ্ছে না। তারপরও তারা এ ঝুঁকি নিল কেন?। কিছু কথা আছে খুব সহজেই বুঝে আসে। অনেক দূরে গিয়ে বোঝার দরকার হয় না। সরকার কেন ওটাতে হাত দিচ্ছে? এতেই বুঝা যায় যে, এতটুকু বাক্য সংবিধানে থাকারও কিছু মূল্য আছে।

সুতরাং কালো এবং সাদার পার্থক্য বুঝতে হবে। আলো-অন্ধকারকে একাকার করা যাবে না। যদিও সেটা হয় আলোর রেখাপাতমাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা মতলববাজরা যা দেওয়ার দিক, আলেম-ওলামাদেরকে থাকতে হবে সতর্ক। কিছুতেই বলা চলবে না ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়; বরং বিষয়টি দেখতে হবে বাস্তবতার নিরিখে, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে। আমরা মনে করি যে, আমাদের এখন যে আলেমপ্রজন্ম আছে এরা গলদ বুঝ নিয়ে ওদিকে অগ্রসর না হোক। তাদেরকে ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হবে আরো বেশি।

২০০৬-২০০৮ তত্ত্বাবধায়ক সময়ের একটি ইসলামী দল ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলের জোটবদ্ধ হওয়া এবং ঐ ইসলামী দলটি কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতার গলদ ব্যাখ্যা দেওয়ার পরই মনে হয়েছিল যে, সেকুলারিজম সম্পর্কে মাদরাসাগুলোতে পড়াশোনা থাকা দরকার এবং এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হওয়া উচিত।

তুরস্ক এর উদাহরণ

ধর্মনিরপেক্ষতার বাতিক একটি জাতিকে কত উঁচু থেকে কত নীচুতে নিক্ষেপ করতে পারে তার নথীর আপনি দেখতে পারেন একসময়কার সালতানাতে উসমানিয়ার রাজধানী তুরস্কে। এটি ঐ তুরস্ক, যে শাসন করেছিল হারামাইন শরীফাইনসহ পৃথিবীর একটি বিশাল অংশ। শত শত বছরের সে উসমানী খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দুই শেষের দিকের সুলতানদের অযোগ্যতা-অদক্ষতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কামাল আতাতুর্ক হলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আদর্শ ব্যক্তি, যিনি এই তুরস্কেই সেকুলারিজমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আতাতুর্ক সাহেব তুরস্কে কী কী ঘটিয়েছিলেন

হয়ত অনেকেরই জানা থাকবে। বিশেষ করে যাদের ইতিহাস নিয়ে নাড়া-চাড়ার অভ্যাস রয়েছে।

খুব সহজ একটা উদাহরণ হল আযান। আযানের ভাষাও ওখানে বদল করে দেওয়া হয়েছিল। মাইকে দেওয়া তো নিষিদ্ধই ছিল। তুর্কি ভাষায় আযান দেওয়া হত। দারুল খিলাফা হওয়ার কারণে সেখানে অসংখ্য মাদরাসা ছিল। সেগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ গর্তের ভিতরে থেকে থেকে কুরআন শিক্ষা চালু রেখেছিল। ওদের বর্ণমালা ঠিক আরবীর মতোই ছিল। এখনো তুর্কী ভাষায় লেখা বই-পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আতাতুর্ক সে বর্ণমালাকে নিষিদ্ধ করে রোমান অক্ষর চালু করেছেন। এখন সেখানে রোমান লিপি চলে। অর্থাৎ ইংরেজী অক্ষরে তুর্কী ভাষা লেখা হয়। এই ভদ্রলোক শুধু ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান তৈরি করে এবং ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সে দেশের প্রতিরক্ষা তথা আর্মি ও আদালতকে কড়া সেকুলার বানিয়ে গেছেন। কঠোরহস্তে সেখানে সেকুলারিজমের ধর্ম ও ধর্মওয়ালাদের বিরুদ্ধে একপক্ষীয় যুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা ধর্মের পক্ষের লোকজন ছিল অস্ত্রশস্ত্রহীন। হাজার হাজার লোককে প্রহসনের বিচার করে-বিনা বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। এভাবে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে সেকুলারিজম। আর আর্মি ও আদালতকে এত কড়া সেকুলার বানানো হয়েছিল যে, তারা কোনো ধার্মিক তো দূরে থাক কোনো ধর্মীয় দলকে ক্ষমতা দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো দাড়িওয়ালা বা কোনো হিজাব পড়ুয়া মহিলার স্বামীকেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেনি; যদিও তাদের কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনেই ঐ ব্যক্তির জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত দলকে নিষিদ্ধ করে দিতে কোনো দ্বিধাই করেনি ঐ শক্তিগুলো।

এসব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। অন্যদেরকে সতর্ক করতে হবে এবং যারা মজলুম তাদের জন্য আশার বাণী হচ্ছে, তুরস্কের বর্তমান পরিস্থিতি। যেখানে ঐ অপশক্তিগুলোর হুংকার কমে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটি ঘটেছে অসংখ্য শহীদের রক্ত, মজলুমদের কান্না, অসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর। এ তুর্কিতেই একসময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হত পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে সেকুলার আর্মি বড় বড় অফিসাররা পাহারাদারি করত। প্রায় বিশ-ত্রিশজন বড় বড় আর্মি অফিসারের রাঙ্গানো চোখের সামনে দিয়ে ভোট দিতে হত। ভোটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে থাকত লোকগুলো। এভাবে তারা যতদিন পেরেছে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বর্তমান সরকার অনেক ধৈর্য ও কৌশলের বিনিময়ে ক্ষমতায় বসেছে। বিভিন্ন কারণে কয়েকবারই দলের নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। কখনো দেশের সংবিধানের সাথে মিল নেই বলে, কখনো দেশের মেয়াজের সাথে মিল নেই বলে, এই সেই বলে পুরো দলকেই অযোগ্য ঘোষণা করে দিয়েছে আদালত ও আর্মিরা। তারপরও তারা ধৈর্য হারায়নি। চেষ্টা ও

মেহনত অব্যাহত রেখেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআলার মেহেরবানিতে এখন সেখানে পরিবর্তন ঘটছে। ২ বছর আগের তুরস্ক সফরে সেখানকার মুসলিম ভাইবোনদের অবস্থা কিছুটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। সেখানকার ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার নরনারীর এখনকার আনন্দাশ্রু দেখে আমার মনে হয়েছে, এটি আসলে আতাতুর্কের দুঃখের কান্না। এতদিন লোকটি বেঁচে থাকলে তার মিশনের সমাপ্তি দেখে যে কান্নায় জড়াত সেটিরই প্রতিচ্ছবি হয়তো এই খুশির কান্না। তবুও ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে নেই। ধৈর্য, কৌশল ও মেহনত এবং সর্বোপরি আল্লাহর রুজ্জুকে আকড়ে রাখার হাতিয়ার ছেড়ে দিলেই বিপদ।

প্রসঙ্গ মিসর

ঐতিহ্যবাহী দেশ মিসরের সর্বপ্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসী। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে। এর আগে মিসরের ইতিহাসে কোনো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিল না। আগের সরকারগুলো রাষ্ট্রীয় ফরমান, সামরিক ফরমান জারি করে ক্ষমতায় ছিল। ড. মুহাম্মাদ মুরসী পশ্চিমা লোকদের বড় বড় আস্থাভাজন, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বড় বড় ব্যক্তিদের মোকাবেলা করে নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও অনেক চড়াই উৎরাই এবং প্রাণহানির পর ক্ষমতায় বসেছেন। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাঁকে শান্তিতে রাষ্ট্র চালাতে দেওয়া হয়নি। আদালত ও সামরিক বাহিনীর নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং সেকুলার ও বেদ্বীন তথাকথিত সুশীলদের বহুমুখি ষড়যন্ত্র চলেছে সমান্তরালে এবং শেষ পর্যন্ত বন্দুকের জোরে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্ধকার কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। এসব কী? এসবই হল সেকুলারিজমের বদ-আছর। এভাবেই সেকুলার শক্তিগুলো যুগে যুগে দেশে দেশে ষড়যন্ত্র ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে মুসলমান ও ইসলামপন্থীদের দমিয়ে দিচ্ছে। তাদের গণতন্ত্র-মানবাধিকার এক্ষেত্রে অন্য কোনো অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্বদেশ পরিস্থিতি

এদেশের কিছু লোক আগেও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, এখনো আছে। কিন্তু তারা কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। বিশাল ধর্মপ্রাণ মানুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। অথচ এ সংখ্যালঘুদের মতবাদই এখন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরো দেশের উপর। সময় কম। আমি সেকুলারিজমের প্রভাবে ঘটে যাওয়া শুধু দু'একটি নযীর পেশ করব।

আমাদের শিক্ষা কমিশন

প্রথমে বলে রাখি, একটা শিক্ষা কমিশন গঠন থেকে শুরু হয়ে কমিশনের রিপোর্ট হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। কমিশনের সদস্য ও সহযোগীরা পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেন। তারা ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি স্বচক্ষে দেখে সে অনুযায়ী এদেশের শিক্ষানীতি তৈরি করেন। এভাবেই কাজ করেছে এ দেশের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন।

প্রত্যেক শিক্ষানীতিরই কতগুলো উপাদান থাকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের শিক্ষানীতির মূল আদর্শ বানানো হয়েছে সেক্যুলারিজমকে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে মাথায় নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে তা উল্লেখও করা হয়েছে। অবশ্য ওটা যদি শব্দে ব্যবহার না করত তবুও তা স্পষ্ট ছিল।

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তিন জায়গাতেই পাকাপোক্ত কড়া বাম ব্যক্তির দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ সাহেব ভদ্র লোক। তিনি সমাজতান্ত্রিক দলের বড় নেতা ছিলেন। বেশি বছর হয়নি আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, যৌবনের পুরো অংশই পার হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে।

শিক্ষা কমিশনের প্রধান ছিলেন কবীর চৌধুরী সাহেব। পরলোকগত হয়ে গেছেন। এ লোক আযানকে কিসের সাথে তুলনা করেছিলেন আপনারা হয়তো জানেন। এসব কথা তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান রাশেদ খান মেনন সাহেব। তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা কারো অজানা নয়। যে দেশের শিক্ষা খাতের তিনটি স্তরে এমন ব্যক্তির থাকবেন সে দেশে কেমন শিক্ষানীতি ও শিক্ষা চলবে তা সহজেই অনুমেয়। আগে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মুসলমান শিক্ষার্থীদের অনেকে এ বলে অনুযোগ করত, দুঃখ করত যে, তাদের কোনো কোনো স্যার প্রকাশ্যেই ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে বিদ্রূপ, কটাক্ষ করেন। তা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বুঝমান শিক্ষার্থীদের সমস্যা। কিন্তু এখন আর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ শোনার জন্য আপনাকে কলেজ-ইউনিভার্সিটি যেতে হবে না। বর্তমান শিক্ষানীতি শিশু শ্রেণী থেকেই মুসলিম ছেলেমেয়ের সেক্যুলার আদর্শে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়েছে। সেভাবেই তৈরি হয়েছে বইপত্র। গত বছর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম ঠিক করতে গিয়ে জেনারেল বিষয়গুলো সরকারি বোর্ডের বই থেকে পড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিভাগের নেগরান সাহেব দেখতে পান বর্তমান সময়ের প্রাথমিক বই ও পূর্বকার বইগুলোর পার্থক্য। কোমলমতি

শিশুদের অঙ্কুর থেকেই শিরকী ভাবধারায় গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট উপাদান এই বইগুলোতে রয়েছে।

প্রসঙ্গ বোরকা

কয়েক মাস আগের কথা। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী হয়ে সেক্যুলারিজম প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যে উচ্চ আদালত ‘সুয়োমটো’ (কারো আপিলের অপেক্ষা না করে স্বপ্রণোদিত রুল) জারি করলেন। বিচারক সাহেব বললেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না। এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না। এ দেশের সংবিধান অনুযায়ী উচ্চআদালত যা বলবেন তা-ই আইন। ভালো যে, পশ্চিমা কোনো রাষ্ট্রের মতো এখানে বোরকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। তবে বিজ্ঞ বিচারক যে যুক্তি দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, যেহেতু আমাদের রাষ্ট্র হল ধর্মনিরপেক্ষ তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝতে কারো অসুবিধা হলে এ ধরনের দু চারটা নজির মনে রাখলেই হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষতিটা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, এই শব্দটাকে গলদভাবে ব্যবহার করে আরো কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা দেখার জন্য হয়তো বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি শুধু চোখ-কান খোলা রাখুন, কয়েক দশকের ইতিহাস দেখুন, স্বদেশী লোকজনের হাতে নিরীহ ধর্মপ্রাণ লোকদের হতাহতের চিত্র দেখুন এবং সেক্যুলার গণতন্ত্রবাদী, মানবতাবাদী, স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করুন। তারা কোন খবরটা কীভাবে ছাপছে, কোন বিষয়টা কীভাবে বিশ্লেষণ করছে তা খেয়াল করুন। এভাবেই একটি দেশের প্রতিরক্ষা, আইন-আদালত, শিক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো পাকাপোক্ত সেক্যুলার হয়ে উঠে এবং পরের কাজগুলো স্বাভাবিক গতিতেই চলতে থাকে। তখন মুরসী, এরদোগান, আবদুল্লাহ গুলদের দেশের অধিকাংশ লোক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলেও তারা হয়তো ক্ষমতায় বসতেই পারেন না, না হয় ক্ষমতাচ্যুত হন। স্বদেশের ৫ জানুয়ারি ২০১৪-এর নির্বাচনের ব্যাপারে মন্তব্য করার দরকার আছে বলে মনে করি না। কিন্তু আপনি এর পরের অবস্থার প্রতি নজর দিন। দেখুন নির্বাচিত (!) ব্যক্তিগণ বেশি খুশি নাকি তাদের সমর্থক শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট অন্যরা বেশি আনন্দিত। কারণ এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার-গণতন্ত্র সবই নসি। নিজেদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার মোক্ষম সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে চান না।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আমাদের এখানে কেউ লিখেছেন কি না জানি না, তবে আরব বিশ্বের কোনো কোনো ডক্টর-প্রফেসর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বইপত্রও লিখে ফেলেছেন। তারা নিজেদেরকে আলেমও মনে করে থাকেন এবং নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল দেওয়ারও চেষ্টা

করেছেন। তারা বলেন যে, ইসলাম নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগী কীভাবে আদায় করবে তা শিক্ষা দেয়, কিন্তু রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তা ইসলাম বলেনি। সুতরাং ইসলামে রাজনীতি নেই। (এ কথাটাই আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এভাবে বলে যে, ধর্ম পবিত্র জিনিস। রাজনীতি থেকে এটাকে আলাদা রাখতে হবে।) যা হোক, ঐ আরব সেক্যুলার আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে ইসলাম ইবাদত বন্দেগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার প্রক্রিয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কথা ইসলামে নেই।

হাদীস দ্বারা দলিল

এরা আমাদের দেশের কারো কারো মতো ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন’ (শুনেছি কেউ কেউ নাকি নিজেদের ভাষণে সূরা কাফিরুনের এই আয়াতকে বুখারী শরীফের হাদীস বলে থাকেন) দ্বারা দলিল পেশ না করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে দু’ একটি হাদীসও পেশ করে থাকেন। এমনই একটি হাদীস হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

হাদীসের প্রেক্ষাপট হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাবীরুন নাখল (খেজুর চাষ সংক্রান্ত একটি বিশেষ পদ্ধতি) বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি তা অপছন্দনীয় বলেছেন। পরবর্তী বছরে ফলন কম হলে তখন তিনি বলেছিলেন-

إِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَاتَّبِعُوهُ

অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে বললে সেটা শুনো, মানো। আর দুনিয়াবী বিষয়ে কিছু বললে মনে করবে তোমাদের এসব বিষয়ে তোমরাই ভালো জান।

এটা তাদের বড় দলিল। কেননা আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন যে, দুনিয়াবী বিষয়ে আমার কথা তোমরা শুনলেও শুনতে পার আবার নাও শুনতে পার। যদি সকল বিষয়ে তার নির্দেশনা মানা আবশ্যিক বিষয় হত তাহলে এখানেও আবশ্যিক হত।

শরীয়তের মেযাজ, খেতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই তা সহজে বুঝতে পারে।

উপরোক্ত হাদীসটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু তরজমা দেখেও যে কেউ বুঝে নিবেন যে, এখানে কোনো কৃষিনীতি পেশ করা হয়নি। বরং খেজুর বাগানে ফলন বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা নিতান্তই একজন কৃষকের নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক যেমন একজন কৃষক তার ক্ষেতে ধান চাষ করবে না গম, সাধারণ জাতের চাষ করবে না হাইব্রিড-এগুলো তার একান্ত বিষয়। যে পর্যন্ত জনস্বার্থের ক্ষতি না হবে ইসলাম তার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কৃষকের এ স্বাধীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল বানানোর যৌক্তিকতা কোথায়? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সে প্রেক্ষিতেই বলেছেন-

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জান।

তাদের এ সকল বক্তব্যের খন্ডন তখনই হয়েছে। বিজ্ঞ আলেমরা যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। ইসলামের এটা বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফে এসেছে-

لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق

অর্থাৎ আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা সব যুগেই ছিল, থাকবে।

অন্য হাদীসে আছে,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

এরা যুগে যুগেই ছিল। ওরা বই লিখেছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও আলেমরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

কারাফীর কিতাব থেকে দলিল

তারা ইমাম কারাফীর কিতাব ‘আলইহকাম’ থেকেও দলিল দিয়ে থাকেন। সেক্যুলারিজমের কিছু কিছু লোক দাবি করেছেন যে, ইসলামের বড় বড় পণ্ডিত, উসূল ও ফিকহবিদগণও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। তার নজির হিসেবে তারা ইমাম কারাফী রাহ.কেও পেশ করেছেন।

ইমাম কারাফী রাহ. তাঁর কিতাবের ২৫ নং প্রশ্নোত্তর অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কার্যাবলির কোনো কোনোটি নবী হিসেবে করেছেন, কোনোটি দাঈ-মুবাশ্শিগ হিসেবে, কোনোটা হাকেম-রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। কোনোটা কাযী ও বিচারক হিসেবে। আবার কোনোটা বাশার বা মানুষ হিসেবেও করেছেন। এ কথাগুলো খুবই সুস্পষ্ট। কারাফী রাহ. বিভিন্ন হাদীসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। ঐ অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ে নিলে হাদীসের কিতাবগুলো বোঝাও সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনো কোনো গবেষক (!) ইমাম কারাফী রাহ.-এর এ কথাগুলোর উল্টো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল যে কাজগুলো নবী হিসেবে করেছেন সেগুলোই শুধু মুসলমানদের পালনীয় বিষয়। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হিসেবে যা করেছেন তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।

অর্থাৎ তাদের দাবি হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযী হিসাবে, হাকেম হিসাবে যা যা করেছেন তার কোনোটিই অনুসরণীয় নয়। (হ্যাঁ, অনুসরণীয় হতে পারে ঐ অ্যারিস্টটল ও আব্রাহাম লিংকনের মত। তাদের মতো ওনাকেও একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ইনিও একজন বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।)

গোড়াটা কিন্তু ঐ জায়গায়। অর্থাৎ এই মতবাদ মানলে শরীয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে দিতে হয়। এটাকে গভীর থেকে দেখতে হবে তাহলে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের দেশের রাজনীতি বা বিশ্ব রাজনীতির এবং রাজনীতিবিদদের অনেক কথাই আছে স্থূল, যা শুধু বলার জন্যই তারা বলে, মানুষ এগুলোকে হালকাভাবে দেখেই অভ্যস্ত।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। এর ক্ষতিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে তা অনুধাবন করা বিবেকবান মানুষের কতর্বা। কারাফী রাহ.-এর কিতাব থেকে দলিল দেওয়া লোকদের কথার আরো কিছু জবাব একটু পরে বলছি।

আলোচনার শুরুতে আমি এনসাইক্লোপিডিয়ার উদ্ধৃতিতে প্রথমেই দেখিয়েছিলাম যে, তারা সেকুলারিজম অর্থ করেছে অহংর ওৎসধস। আসলে খুব সহজে চিন্তা করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে আসে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা যখন থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তখন কিন্তু অন্যান্য ধর্মওয়ালারা রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করেছে এমন নয়। রাষ্ট্রের আইন নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না। খ্রীষ্টানরা তো তাদের ধর্মকে চার্চকেন্দ্রিক করে ফেলেছে আগেই। আরবদের ভাষায়-

دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله

অর্থাৎ ধর্ম মসজিদ পর্যন্ত আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে রাষ্ট্রনায়কদের মাধ্যমে। একটার সাথে আরেকটার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এতকিছুর পর আবার ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখার কেন দরকার হল?

খুব স্পষ্ট কথা। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখাই আসল উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ইসলামের নীতিমালাই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

মুসলিম শাসকদের ইসলামী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে। সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অন্য যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মূলত এটাই ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেকুলারিজমকে Anti Islam বলা হয়েছে। Anti Religion নয়। ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী। এই সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা পর্যন্তই এবং ডলারের গায়ে In God we trust লিখে দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এতটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না। তো সেকুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। এ কারণেই Anti Islam ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-এ কথা শুনে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোটাই ধর্মহীনতা।

শরীয়তে ধর্মনিরপেক্ষতা নেই

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وان احكم بينهم بما انزل الله

আর তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন ঐ আইন দ্বারা, যা আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলা নাযি ল করেছেন।-সূরা মায়দা : ৪৯

অন্যত্র আছে-

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ... فاولئك هم الكافرون، ... فاولئك هم الفاسقون
যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা জালিম ... তারা কাফির ... তারা
ফাসিক।-সূরা মায়দা : ৪৪, ৪৫ ও ৪৭। এ তিনটি আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর বিধান ভিন্ন
ফয়সালাকারীকে জালিম, কাফির ও মুনাফিক বলা হয়েছে। এ আয়াতগুলো পড়ুন এবং
কারাফীর কথার গলদ ব্যাখ্যাকারী সেকুলার মুহাক্কিকদের (!) বক্তব্য শুনুন, জবাব আপনিই
দিতে পারবেন।

সেকুলারিজমের বক্তব্য হচ্ছে, আইন-আদালত, বিচারকার্য এসব চলবে রাষ্ট্রীয় নীতি ও
জনগণের চাহিদা অনুযায়ী। রাষ্ট্র যেভাবে আইন করে সেভাবে চলবে। ধর্মের সেখানে
প্রবেশাধিকার নেই। ঐ কোনো কোনো সেকুলারপন্থী তথাকথিত আলেমের বক্তব্য হল,
খলীফারা যে আইনে আদালত ও রাষ্ট্র চালিয়েছেন তা তাদের নিজস্ব বিষয়। এটি ইসলামের
কিছু নয়। আপনি উপরোক্ত আয়াত এবং এ সংক্রান্ত আরো যত আয়াত আছে সেগুলো
দেখুন। এগুলোতে কি বলা হয়েছে, ঐ সকল হুকুম-আহকাম খলীফাদের পর্যন্ত সীমিত?
পরবর্তীদের জন্য তা পালনীয় নয়? দেখুন, সেকুলারিজম এমন কোনো বিষয় নয় যে, তার
অসারতা সম্পর্কে জবাব দিতে হলে মাটি খুঁড়ে বের করে দলিল দিতে হবে। বরং শরীয়তের
বিষয়গুলো হল

ليلها كنهها

অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখানে অস্পষ্টতা বা অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-
বন্দেগী থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা
সুপ্রমাণিত। কিন্তু এখন ভাবটা এমন যে, নামায, রোযা ইত্যাদি মানুষকে তাদের ধর্ম মতো
করতে দাও। (আসলে এটিও কথার কথা, না হয় আপনি কি নামায ঠিকমতো আদায় করতে
পারছেন, জুমআর খুতবায় খতীব সাহেবেরা কি কুরআন-হাদীসের কথা স্বাধীনভাবে বলতে
পারছেন, দুআ-মুনাজাতও কি তারা তাদের মতো করে করতে পারছেন? উত্তর আপনাদের
জানা আছে।) আর রাষ্ট্র ও আদালত পরিচালিত হবে মানবরচিত আইনে। সুতরাং কুরআনের
বিধানের সাথে সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক তিনি মীরাছের হিস্যা তার মতো করে বণ্টন
করে দিতে পারবেন। এর জন্য মুসলিম স্কলারের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বিচারক নিজেই
লিবারেল ও স্বাধীন। ফতওয়া সম্পর্কে ধারণা থাকুক বা না থাকুক, এমনকি ফতোয়ার সঠিক
সংজ্ঞাও যদি জানা না থাকে তিনি ফতোয়া অবৈধ বলে দিতে পারবেন এবং বলতে পারবেন
যে, ফতওয়া দিতে পারবে শুধু উচ্চ আদালতের বিচারক। ফতওয়া দেওয়ার আইনগত
কর্তৃপক্ষ হল কোর্ট।

সেক্যুলারিজমটা এমনই। অন্য ধর্মের ব্যাপারে এর তেমন মাথাব্যথা নেই। তাদের বিরোধিতারও দরকার নেই। কারণ অন্য ধর্মওয়ালারা এ নিয়ে কোনো চিংকার-চোঁচামেচি করে না। ইন্ডিয়ার উগ্রপন্থী বিজেপি কি কখনো দাবি উঠিয়েছে যে, গীতা, মহাভারত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে হবে? খ্রীষ্টানরাও একথা বলেনি। কারণ তাদের নিকট ইসলামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলোই নেই। এই অতুলনীয় ও সুমহান নীতি কেবল ইসলামেরই রয়েছে। সেক্যুলারিজম এসেছেই ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য, স্রষ্টার আইনের বদলে নিজেদের মনমতো করে মানুষকে শাসন করার জন্য।

কিছু মোটা কথা

আপনি পুরো কুরআন মজীদ, বিশেষ করে মাদানী সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন তাতে নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদির বাইরে অন্যান্য বিষয়ের আরো কত আয়াত রয়েছে। হাদীসগ্রন্থগুলোতে ইবাদাত অধ্যায়গুলোর তুলনায় পরিবারনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি, লেনদেন পদ্ধতি, কৃষি-সেচ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোর হাদীস সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব করুন তাহলে দেখবেন দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সংখ্যা কত বেশি। সেক্যুলারিজম মানতে হলে আপনাকে ঐসব কিছুই এখন রহিত হয়ে গেছে-ঘোষণা করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হল হুদূদ-কিসাস কার্যকর করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার কারণে তাকে কিতাবুল হুদূদের হাদীসগুলোতে, সূরা নূরের আয়াতসমূহে টীকা লাগিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। তাই সেক্যুলারিজম নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তার সাথে বুঝতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ লা দ্বীনী ও Anti Islam নীতি।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ রাহ.কে খলীফা ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল যে, أَيْحَاسِبُ الْخَلِيفَةَ খলীফারা যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের কি হিসাব দিতে হবে? পাকড়াও হবে?

আবু যুরআ রাহ. বলেছিলেন, অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে এবং দলিল হিসেবে তিনি কুরআন মজীদে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

অর্থ : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।-সূরা ছোয়াদ : ২৬

ইবনে কাসীর রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন-

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل

অর্থ : এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাসকদের প্রতি নির্দেশনা যে, তারা যেন লোকদের মধ্যে সুবিচার করে।

বিচার একমাত্র আল্লাহর আইনেই হওয়া বাধ্যতামূলক। ধর্মনিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ ভাব-ভঙ্গি বলতে কিছু নেই।

শরিয়াতে ধর্মের স্বাধীনতা: মাত্রা এবং মানদণ্ড

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ একাডেমির কাউন্সিল, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহতে ১-৫ জুমাদা আল-উলা ১৪৩০ হিজরি (২৬-৩০ এপ্রিল ২০০৯) তারিখে তাদের ১৯তম অধিবেশন আয়োজন করছে।

"শরীয়াতে ধর্মের স্বাধীনতা: মাত্রা এবং মানদণ্ড" সম্পর্কিত একাডেমিতে জমা দেওয়া গবেষণাপত্রগুলি পরীক্ষা করে,

একাডেমির কাউন্সিল কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব বিবেচনা করে,

ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি শীর্ষস্থানীয় রেফারেন্স হিসেবে এই বিষয়ে একাডেমির দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য মুসলিম বিশ্বের ভেতরে এবং বাইরে জরুরি প্রয়োজন লক্ষ্য করার পর,

বিষয়টির উপর আলোচনা শুনে,

সমাধান করে

প্রথমত: ধর্মীয় স্বাধীনতা শরীয়তের একটি মূল নীতি এবং একটি ধারণা যা মানব প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এবং ইসলামে দায়িত্বের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট শরিয়াহ মানদণ্ড সাপেক্ষে। ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য মানবিক মর্যাদা বজায় রাখা।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত এবং উম্মাহর ইসলামী পরিচয়কে বিলীন করে দেওয়ার লক্ষ্যে আগত চিন্তাভাবনা এবং সকল ধরনের ধর্মীয় ও অধর্মীয় আক্রমণের বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে।

তৃতীয়ত: মুসলমানরা কুরআনের নীতি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, "ধর্মে কোন জোরজবরদস্তি নেই।" (আল-বাকারা, ২৫৬) ইতিহাস জুড়ে, মুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় তাদের সাথে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি সহনশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতা দেখিয়েছে। অমুসলিমদেরও ইসলামী বিশ্বাসকে সম্মান করা উচিত এবং নবী (সাঃ) এবং ইসলামের পবিত্র স্থান ও প্রতীকগুলির বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক কাজ বন্ধ করা উচিত।

চতুর্থত: সাম্প্রদায়িক ও আইনশাস্ত্রীয় বৈচিত্র্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতা, তাদের সম্প্রদায় নির্বিশেষে, একটি শরিয়াহ কর্তব্য যা কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলাম

একটি ধর্মমত ঐক্যমত্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদ, ঐক্য এবং সহযোগিতার আহ্বান জানায় এবং মতভেদের ক্ষেত্রে একে অপরকে ক্ষমা করে দেয়।

পঞ্চম: ইসলামী অবস্থান ও মৌলিক বিষয়গুলিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার উদ্ভাবন এবং ইসলামী বিশ্বাসের সুপরিচিত দিকগুলি সম্পর্কে মুসলিম সমাজের মধ্যে সন্দেহের উদ্বেক বন্ধ করতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার আড়ালে সাধারণত যে ধরনের অপকর্ম করা হয়, তা কঠোরভাবে দমন করা উচিত যাতে সমাজ, এর ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় এবং অমুসলিমদের ইসলামের বিরুদ্ধে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ব্যবহার করার কোনও সুযোগ না থাকে।

ষষ্ঠত: কুফর ও ধর্মত্যাগ সম্পর্কে শরিয়াহর মতামত প্রদানের বিষয়টি কেবলমাত্র স্বীকৃত ফিকাহ পণ্ডিতদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত, যেখানে বিচার বিভাগ শরিয়াহ স্বীকৃত উদ্বেগগুলি অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময়সীমার মধ্যে অনুতাপের অনুরোধ এবং অস্পষ্টতা দূর করার বিষয়ে ফিকাহ পণ্ডিতদের নির্দেশিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে।

সপ্তম: ধর্মত্যাগের প্রকাশ্য প্রদর্শন মুসলিম সমাজ এবং ইসলামী বিশ্বাসের ঐক্যের জন্য একটি প্রকৃত বিপদ এবং অমুসলিম বা মুনাফিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে সন্দেহ তৈরিতে এটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। অতএব, ধর্মত্যাগের অভিযোগকারী এমন শাস্তির যোগ্য যা কেবল বিচার বিভাগ ছাড়া অন্য কেউ প্রয়োগ করতে পারে না যাতে সমাজ এবং এর নিরাপত্তার জন্য তার বিপদ এড়ানো যায়। এই রায় ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক মূল্যবোধ এবং জনশৃঙ্খলাকে সম্মান করে এমন ব্যক্তিদের জন্য ইসলাম যে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে তার বিরোধিতা করে না।

সুপারিশ

মুসলিম সরকারগুলোর কাছে তাদের মুসলিম সমাজের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আবেদন করা, যার মধ্যে রয়েছে দায়িত্বশীল স্বাধীনতা, খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা, চাকরির

সুযোগ এবং অন্যান্য সকল চাহিদা, যাতে নতুন প্রজন্মকে বস্তুগত প্রলোভন এবং ইসলামবিরোধী ধারণা প্রচারের অন্যান্য সকল উপায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা যায়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আমি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছি এবং সেক্যুলার ব্যক্তিবর্গের কথা ও লেখা থেকে প্রমাণ করেছি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থবোধক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হল, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যা সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য। এবং প্রায় ৯০% মুসলমানের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়ন গণতন্ত্র, মানবাধিকার পরিপন্থী কাজ। আর দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া এবং এটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা বাস্তবতা বিবর্জিত হঠকারিতা ও সীমিত সংখ্যক লোকের মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। যারা এমনটি করছে তারা কিন্তু প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংকীর্ণ করছে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে সঠিক ইসলামের উপর পরিচালিত করুন। সকল ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস থেকে দূরে রাখুন।

ইসলাম মানুষের জীবনের সব দিক নিয়ে নির্দেশনা দেয়। যে ইসলামে বিশ্বাসী সে জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী শরীয়তে বিশ্বাসী হতে বাধ্য। নিছক ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম হয়ে জীবনের বহু দিক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনবিধান মতো চলে প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।—সূরা বাকারা, ০২ : ২০৮
আল্লাহ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।—সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ১০২
এখানে ঈমান ও ইসলামে পূর্ণাঙ্গ দাখিল হতে এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ এ কথাও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে,

আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন—ধর্ম বা জীবনবিধান হচ্ছে ইসলাম।—সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ১৯

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (১৫)

আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা তালাশ বা অবলম্বন করবে, তার কাছ থেকে সেটি কোনো দিনই গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে হবে ব্যর্থ ও মহা ক্ষতিগ্রস্ত।—সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ৮৫

ইসলামের এ স্পষ্ট ঘোষণা থেকে দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, ইসলামে থাকাবস্থায় মুসলিমদের পক্ষে আংশিক বা পূর্ণ ইসলাম ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বানিয়ে রাখার অধিকারও নেই। ইসলামের পাশাপাশি অপর কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় নেই। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে ধর্মহীন হওয়ার অবকাশও নেই। মুসলমানদের কেবল মুসলমান হতে হবে, সেক্যুলার মুসলমান হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সেক্যুলারিজম কি কোরআন—সুন্নাহ সমর্থন করতে পারে? এ কথা বলা কি ঠিক যে, ইসলামে সেক্যুলারিজম আছে? না, এ কথা কোনোদিনই বলা যাবে না। এ কথা ঠিক নয়, হতে পারে না। ধর্মহীনতা কী করে ইসলামসম্মত হতে পারে। এমন বিষয়, যার সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই, এটি কেমন করে ইসলাম সমর্থন করতে পারে। একজন মুসলমান কেমন করে এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারে? মুসলমানের জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সেক্যুলারিজম স্থান পেতে পারে না।

ব্যক্তি মুসলিমের জীবনে, মুসলিম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক এবং মানবিক আচরণ কেমন হবে। অন্যদের নাগরিক নিরাপত্তা ও ধর্ম পালনের অধিকার কতটুকু সুরক্ষিত থাকবে, এ প্রশ্ন যখন ওঠে তখন অনেকে এক্ষেত্রে ইসলামের আচরিত রীতি, পদ্ধতি ও সম্প্রীতির কালচারকে ইসলামের নীতি আদর্শ বা সৌন্দর্য না বলে একে সেক্যুলারিজম আখ্যা দিয়ে ফেলেন। যা মারাত্মক ভুল এবং ইসলামের প্রতি অবিচার।

ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা, নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান, শাসন সুবিচার এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতি—ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ দুনিয়াতে নজিরবিহীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এসব বিষয় কোরআন ও সুন্নাহয় আছে। ইসলামের ১৩শ বছরের বিশ্বনেতৃত্বের ইতিহাস সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। একে ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ না বলে এর নাম সেক্যুলারিজম দেওয়া বিশাল বড় এক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি সাধারণ রাষ্ট্রেও সব ধর্মের মানুষের সমান নাগরিক অধিকার এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়ার নাম আর যাই হোক সেক্যুলারিজম হতে পারে না। তরজমা হিসেবে ধর্মহীনতা বলে চালানো না গেলে একই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলাও সঠিক কাজ না। এটিকে বরং ‘নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার’, ‘ধর্ম পালনে সবার স্বাধীনতা’ বলা কর্তব্য ও অধিক যুক্তিযুক্ত।

কেননা, সেক্যুলারিজমে ধর্মহীনতা স্পষ্ট। যে মতবাদের সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই, সেটি কেমন করে সব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করবে? এটি তো রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্মহীন, ধর্মবিমুখ এবং ধর্মদ্রোহী বানাবে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে যার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই সে মতবাদ নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সমান অধিকার কী করে দেবে? অতএব, ধর্মকে যারা স্বীকার করে তাদের এ মতবাদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত হবে না। তাদের এ নাম ও পরিভাষাটি এড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাদের বলা উচিত, সব ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ।

ঠিক যেমন বঙ্গবন্ধু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র মানে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। কার্ল মাক্সের নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কার্ল মাক্স লিখেছেন, ‘এদেইজম ইজ আনসেপারেবল পার্ট অব মাক্সিজম’। মানে, আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা মাক্সবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ অর্থে তো ধর্ম ও স্রষ্টায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের জনগণের সংবিধানে মাক্সিজমের ফলিতরূপ সোশ্যালিজম আসার কথা না। এসব পরিভাষা বিশেষ করে সেক্যুলারিজম ও সোশ্যালিজম প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে বঙ্গবন্ধুর উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু দিয়ে। কাজটি করার অগ্রাধিকার রাখেন তাঁর কন্যা।

কারণ, একটি নির্দিষ্ট বিষয় বোঝানোর জন্য কোনো পশ্চিমা ধর্মহীন নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শকে তার ভালোমন্দসহ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী স্বাধীন জাতির সংবিধানের স্তম্ভ বানানো আবহমান বাংলাদেশের বিশ্বাস ও চেতনার সাথে যায় কি না, সেটা সংবিধান রচয়িতা, সংশোধন পরিমার্জনকারী, আইনপ্রণেতা প্রতিনিধিবর্গের সামনে সব সময়ই একটি বিবেচ্য এবং ভাববার বিষয় হয়েই থাকবে।

০২.

কোরআনে আছে কথাটির অর্থ ধরা হবে ইসলামে আছে। কারণ ইসলামের মৌলিক সব বিষয় কোরআনে বিস্তারিতভাবে থাকে না। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবৃত বাস্তবে রূপান্তরিত হয়। এখানে কোরআনে আছে কি না, এর অর্থ ইসলাম একে সমর্থন করে কি না।

এখানে প্রথমেই পাঠককে জানতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতা কী। যদি একটি সমাজে সব ধর্মের লোকেদের নাগরিক সম্প্রীতি, সামাজিক সহাবস্থান ও সবার নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার বুঝানো হয়, তাহলে উত্তরে বলা যাবে যে, এমন ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহাবস্থান ইসলামে আছে। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেউ পশ্চিমা পরিভাষা সেক্যুলারিজমের সরাসরি অনুবাদ তথা সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে নিয়ে বলতে চান, এটি কি কোরআনে বা ইসলামে আছে? তাহলে এক কথায় জবাব হবে, না অবশ্যই নেই। থাকতে পারে না। কারণ ইসলাম একটি ধর্ম। কোরআন এর ধর্মগ্রন্থ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই ধর্মের রাসূল। যিনি নিজে একটি ধর্মের প্রবক্তা তিনি কী করে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন? একটি ধর্মগ্রন্থ কী করে ধর্মনিরপেক্ষ হতে

পারে? ইসলাম একটি ধর্ম হয়ে সেটি কী করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়।

এ নিয়ে আলাপ খুবই দীর্ঘ। সীমিত অর্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বোঝাতে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ ব্যবহার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এসব তো ইসলামী সমাজ ও সভ্যতায় স্বীকৃত ও যুগে যুগে যথাযথ উপায়ে পরিচালিত কিন্তু এ শব্দটির মূল পরিভাষা সেক্যুলারিজম কোনোভাবেই ইসলামসম্মত নয়। এটি একটি ঈমান, ইসলাম ও কোরআনবিরোধী পরিভাষা, যাতে কোনো মুসলমান বিশ্বাসী হতে পারে না।

ইসলামের প্রথম দিকে মক্কার কাফির মুশরিকরা আল্লাহর নবীর নিকট একটি সমঝোতা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল যে, কিছুদিন আপনি আমাদের উপাস্য দেবদেবীর উপাসনা করবেন আর কিছুদিন আমরা আপনার আল্লাহর ইবাদত করব। সব ধর্মের একটি সমন্বিত ধর্মীয় সংস্কৃতি চালুর চিন্তা থেকেই এ প্রস্তাব তারা দিয়েছিল। এর জবাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُوا مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

‘হে রাসূল, আপনি বলে দিন, হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা যাদের উপাসনা করো আমি তাদের উপাসনা করি না। আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমরা যাদের উপাসনা করো আমি তার ইবাদতকারী নই। আমি যাঁর ইবাদত করি তোমরা তাঁর উপসনাকারী নও। তোমাদের ধর্মকর্ম ও পরকালীন পরিণামফল তোমাদের আর আমার ধর্মকর্ম ও পরকালীন পরিণামফল আমার।’ যার শেষ পঙ্ক্তিটির আরবী হলো, ‘লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।’

এখানে কাফির—মুশরিকদের সাথে ধর্মকর্ম, বিশ্বাস ও উপাসনা এক হওয়া যেকোনো দিনই সম্ভব নয়, সে কথাটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের ধর্ম ও পারলৌকিক প্রতিফল একরকম, আমার ধর্ম ও পারলৌকিক প্রতিফল অন্যরকম। এটি সব ধর্মের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার মিউচুয়াল ঘোষণা নয়। কোরআন বরং এখানে অন্যান্য ধর্ম থেকে

নিজেকে দায়মুক্ত ও স্বকীয় ঘোষণা করেছে। অতএব, এ আয়াতের অর্থ, মর্ম বক্তব্য ও বার্তা অনুধাবন করেই এর প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এর গড়পড়তা ব্যবহার কোরআনের উদ্দেশ্যের সাথে যায় না।

০৩.

কেউ যদি ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী হন সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। রিদ্দাহ বা ইরতিদাদ ইসলামে কুফুরীর চেয়েও বেশি নিন্দিত বিষয়। কেননা ঈমান পাওয়ার পর আবার বেঈমান হয়ে যাওয়া মানবজীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। একজন মুসলমান বিশ্বাসগতভাবে সেকুলার হওয়া এ ধরনেরই একটি দুঃখজনক বিষয়। আরেকটি পর্যায় আছে পশ্চিমা সেকুলার বা ধর্মহীন না হয়ে নিজের তৈরি অর্থবোধক ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সমাজে সকল ধর্মের মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। রাষ্ট্র ও রাজনীতি, শাসন ও বিচার বিবেচনায় ইসলামী পদ্ধতিতে এই স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। মুসলিম শাসননীতিতে জিম্মিদের অধিকার একটি আকর্ষণীয় বিষয়। অমুসলিম জিম্মি নাগরিকদের জন্য মুসলমানদের জন্য হারাম এমন কোনো কোনো বিষয়ও তাদের সমাজে প্রচলিত থাকায় মুসলিম রাষ্ট্রে এসবের বিশেষ অনুমতি থাকে। যা ইসলামই পৃথিবীকে শিখিয়েছে। আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে কূটনীতিকদের বেলায় যেমন বিশেষ আইন থাকে ঠিক তেমনই মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মি নাগরিকদের জন্য অধিক মানবাধিকার সংবলিত বিশেষ আইন রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দাঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল

স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাজ্ঞান থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লাস্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহুদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহুদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা;

সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাত্মুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যিকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিদ্বারা কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: “মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না”। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: “রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে”।

আমরা এখানে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্থায়ী শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পারে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

মুসলিমদের দ্বীন বিকৃত করার নিমিত্তে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন:

১. দুর্বল প্রকৃতি ও দোদুল্যমান ঈমানদার লোকদেরকে সম্পদ ও পদের প্রলোভন দেওয়া, অথবা নারীর টোপ দেওয়া, যেন তারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ও শ্লোগান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ও প্রচার করতে পারে। অবশ্য তার পূর্বেই তারা তাদের প্রতারণার শিকার লোকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায়, যেগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, সেগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরে যেন মানুষ তাদেরকে আলেম, চিন্তাবিদ ও প্রচুর জাভা হিসেবে জানে এবং সাধারণ লোকদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাদের দ্বারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করায়, এভাবে তারা অনেক মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

২. কতিপয় লোককে তারা পাশ্চাত্য দেশে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদীদের আশ্রমে লালন করে এবং তাদেরকে একাডেমিক বিভিন্ন নামী-দামী পদবি প্রদান করে, যেমন ‘ডক্টরেট’ অথবা ‘প্রফেসর’ ইত্যাদি। অতঃপর সেখান থেকে প্রত্যাভর্তন করার পর দ্বীনকে বিকৃত ও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের অস্তিত্ব কতটুকুন ক্ষতিকর; অথচ তারাই সুশীল নামে খ্যাত, স্কুল-কলেজ ও ভার্শিটির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যাস্ত।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের অপর একটি কূটকৌশল হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্মকে বিভক্ত করা, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমালোচনা ও লেখা-লেখি করা এবং মানুষদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখা। এ লক্ষ্যে তারা দীনি ছাত্র, ধর্মীয় আলেম ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী দাঈদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়, যেন তারা মানুষদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেশ-নসিহত প্রদানের পরিবর্তে তর্কে ব্যস্ত থাকে।

৪. দীনি আলেম, ধর্মীয় ছাত্র ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দাঈদেরকে রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পশ্চাৎগামী, চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা। আরো প্রচার করা যে, তারা পদ, সম্পদ ও নারী লোভী, যেন মানুষেরা তাদের কথায় বিশ্বাস না করে ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ময়দান উন্মুক্ত হয়।

৫. বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও আলেমদের ইখতিলাফ নিয়ে বেশী আলোচনা করা, যেন মানুষ জানে দ্বীন মতবিরোধের স্থান এবং দীনি আলেমদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। এভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে শিখবে যে, দ্বীনের কোনো বিষয় অকাট্য ও চূড়ান্ত নয়, অন্যথায় এতো বিরোধ সংগঠিত হত না। ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা এ দিকটার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কুপ্রভাব ছড়ানোর লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়কে তারা বড় আকারে পেশ করে, যার অর্থ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

৬. পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ও অপরিচিত কালচার সেন্টার নির্মাণ করা। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম দেশে নির্মিত হলেও পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। ইসলামের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা চেষ্টার ক্রটি করে না। একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাস্প ছড়ানোর কাজও করে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক, দার্শনিক ও মনোবিদ্যা বিভাগে তাদের পদচারণা ও প্রচারণা খুব বেশী।

৭. শরীয়তের কতক বিধান, যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে, তার উপর স্থানকাল-পাত্র ও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জমে থাকা। এভাবে তারা শরীয়তের ভুল ও বিকৃত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

উদাহরণত শরীয়তের একটি নীতি রয়েছে: ‘মাসালেহে মুরসালাহ’ (জনস্বার্থ), এ নীতিকে তারা উল্টোভাবে বুঝে ও ভুল পথে প্রয়োগ করে, অতঃপর তার দোহাই দিয়ে ইসলামের যে অংশ তারা পছন্দ করে না তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে, যেকারণে মুসলিম দেশে ধীরেধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুত হচ্ছে।

অনুরূপ শরীয়তের আর একটি নীতি রয়েছে: “দু’টি ক্ষতিকর বস্তু থেকে কম ক্ষতিকর বস্তু ও দু’টি ফেতনা থেকে ছোট ফেতনাকে গ্রহণ কর”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও বৈধতা প্রদান করে”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “ফায়দা হাসিল করার চেয়ে ক্ষতি দূর করাই অধিক শ্রেয়”। অনুরূপ একটি নীতি হচ্ছে: “ইসলাম সর্বযুগে উপযোগী”। আরেকটি নীতি রয়েছে: “অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ফতোয়া ভিন্ন হয়”। এ জাতীয় নীতিকে তারা গলদভাবে প্রয়োগ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ এসব নীতিকে তারা কাফেরদের দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান, রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মুসলিম দেশে আমদানি করার হাতিয়ার হিসেবে গলদভাবে প্রয়োগ করে, যেন অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জেনে বদ্বীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাদের এ কৌশল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, কারণ এতে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়, তারা ভাবে এসব তো শরীয়তের নীতি ও ইসলামের নিকট স্বীকৃত। তাদের এ কৌশলের মুখোশ উন্মোচনের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব প্রয়োজন, তবেই দ্বীন থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হবে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝানো যাবে।

এখানে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, এ জাতীয় নীতির উপর তাদের ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তারা ইসলামের এসব নীতিতে বিশ্বাসী। আবার এ অর্থও নয় যে, যে-উৎস থেকে এসব বিধান এসেছে, সে ইসলামের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার উপর তাদের ঈমান রয়েছে, বরং এসব তাদের একটি বাহানা, এভাবে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত মতবাদ বাস্তবায়ন করতে চায়।

আপনি যদি তাদেরকে ইসলামের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার প্রতি দাওয়াত দেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন আল্লাহর তাওহীদ, আখিরাতের প্রতি ঈমান, আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা ও তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরা; অথবা ইসলামী খিলাফত পুনরুদ্ধার ও কায়ম করার আলোচনা এবং কুফরি মতবাদসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করেন, যেমন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি, তাহলে তারা ভাববে আপনি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন। তারা বলবে, ‘এটাই তো রাজনীতি, আর রাজনীতির সাথে দ্বীনকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।’

এ জাতীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদের জন্য যদি সেসব বিষয় জুমার খুতবা, মসজিদের হালকা, বিভিন্ন সেমিনার ও ছোট ছোট কিতাবে প্রকাশ করা হত, যা পড়া ও বুঝা সহজ, তাহলে তাদের থেকে এরূপ বিচ্যুতিমূলক কথা কখনো বের হত না।

আমরা লেখক বা প্রকাশক যাই হই, পাঠকদের চাহিদা ও বেচাকেনার বাজার গরম রাখার জন্য দ্বীনকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা, দ্বীনকে বিকৃত করা, তার এক বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে অপর বিষয়কে ত্যাগ করার মত মারাত্মক ক্ষতিকর কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ও তাতে অংশগ্রহণ না করা ওয়াজিব। এরূপ আচরণ আমাদের থেকে প্রকাশ পেলে প্রকারান্তরে আমরাই দ্বীনের গণ্ডিকে সংকীর্ণ করে ফেলব এবং দ্বীনকে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার ক্ষেত্রে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সহযোগী হয়ে যাব।

কোনো লেখক বা প্রকাশক বলতে পারেন: “আমরা এ বিষয়ে লেখি না, কারণ এগুলো অনেক বড় ও গভীর বিষয়, এতে ভুল করা সামান্য ব্যাপার নয়, এসব বিষয়ে লেখার জন্য অনেক ইলম প্রয়োজন, যা আমাদের নেই”। হ্যাঁ এ কথাও সত্য, কারণ বর্তমান যারা এ বিষয়ে লিখছে, তারা তার উপযুক্ত নয়... তার কারণ হয়তো তারা বিষয়টি বুঝেন না, অথবা ভুলভাবে বুঝেন-তাদের জ্ঞান এ ব্যাপারে পরিপক্ব নয়, যদি এরূপ সঠিক হয় –এটাই সঠিক- অনেকের

ক্ষেত্রে, তবে বড় আলেমগণ কোথায়, কোথায় ওলামা মাশায়েখগণ, এটা যদি তাদের দায়িত্ব না হয়, তাহলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে তাদের কাজ কী?!

ইসলাম প্রচার ও ব্যাপক করার জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে ভার্শিটি পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষক, প্রফেসর ও অধ্যাপকদের নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করা জরুরি:

১. বিশুদ্ধ শিক্ষানীতি ও সিলেবাস তৈরি করা, যেন শিক্ষার প্রত্যেক শাখা ইসলামের সেবায় ব্যবহার হয়, একমাত্র গবেষণাই যেন তার উদ্দেশ্য না হয়। উল্লেখ্য যে, আমাদের দ্বীন আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাতে অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল প্রবেশ করতে পারে না, আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও আল্লাহর সৃষ্ট, অতএব বিজ্ঞান ও দ্বীনের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই, তাই বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারকে ঈমানের সেবক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনুরূপ নাস্তিকতার বাতুলতা প্রমাণ ও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিজ্ঞানের অনেক মূলনীতিকে ব্যবহার করা যায়, যাতে খোদ নাস্তিকরা বিশ্বাসী, যার বিপরীত কোনো নীতি তারা বিশ্বাস করে না। এ জন্য ছাত্রদের সিলেবাস নির্ধারণের সময় এসব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরি। এগুলো অবশ্যই স্পষ্টভাবে বুঝাবে, তাতে ইশারা ও ইঙ্গিত প্রদান করা যথেষ্ট নয়। এ বিষয়টিকে যথাযথভাবে বুঝা ও বাস্তবায়ন করা সিলেবাস প্রণয়ন ও নির্ধারণকারীদের উপর একান্ত কর্তব্য।

২. শিক্ষা উপকরণকে তাতে প্রবিষ্ট কুফরি ও গোমরাহি মুক্ত করা, হতে পারে কোনো বই এমন লোকের তৈরি, যে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা দ্বীন বিদ্বেষী। তাই মুসলিম শিক্ষক কখনো বই-পুস্তক যেভাবে আছে সেভাবে পাঠদান করে ক্ষান্ত হয় না, এরূপ করা বৈধও নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে, বই-পুস্তকে বিদ্যমান ভ্রষ্টতা ছাত্রদেরকে বলা ও তা থেকে সতর্ক করা। অতএব শিক্ষককে শুধু বিষয়ের শিক্ষক হলে চলবে না, তাকে অবশ্যই এ বিদ্যাগুলোকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার কাজ করত হবে এবং তাতে বিদ্যমান সন্দেহগুলো দূর করতে হবে। এভাবে তিনি নিজেকে একজন আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দাঈ, উপদেশদাতা ও সঠিক পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

৩. ইসলামকে ভালোভাবে বুঝানো, অথবা ইসলামী আকিদা প্রতিষ্ঠা করা, অথবা মুসলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া, তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করা, অথবা ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার যখন কোনো সুযোগ আসবে শিক্ষক সেটাই লুফে নিবেন।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষককে অবশ্যই আধুনিক ও শর'য়ী উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া জরুরি, তাহলে তিনি সঠিকভাবে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন, যা দিয়ে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন।

এ গবেষণার পরিশিষ্টে এসে এবার আমরা যা জানলাম তা বাস্তবে নিয়ে আসা ও তার উপর যথাযথ আমল করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করি। এখানে আমল দ্বারা উদ্দেশ্য সে আমল নয়, যার উপকারিতা শুধু ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকে, এটাও একটা উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, তবে আমাদের উদ্দেশ্য সে আমল, যার দ্বারা ব্যক্তির সাথে মুসলিম উম্মতও উপকৃত হয়।

আমরা আমাদের ও অধীনদের ক্ষেত্রে বাস্তব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হব ও তার উপর আমল করব। এতেই ক্ষান্ত হব না, বরং মানুষদেরকে আহ্বান করব ও ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে বুঝাব। কিভাবে আমাদের শত্রুরা ভেতরে-বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করব। মুসলিম উম্মাহ বর্তমান কি পরিমাণ দুর্দশায় ভোগছে তাও তুলে ধরব তাদের সামনে। কোনো কষ্ট, বাঁধা ও বিরোধিতা আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারবে না। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী ও তার দোসররা আমাদেরকে কোণঠাসা করে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমরা তার থেকে পিছপা হব না কখনো।

অবশ্যই আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে দ্বীন মোতাবেক কাজ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের পছন্দনীয় আকিদা, কথা ও কর্মের উপর মানুষদের উঠাতে হবে, প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, যেন ফিতনা দূরীভূত হয় ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার মনে হয় না, মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে আমি যথাযথ আলোচনা করতে পেরেছি, তবে এ গ্রন্থ একটি স্মারক হিসেবে কাজ করবে সন্দেহ নেই, যার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে উপকৃত করবেন, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর।

ড. রেদওয়ান মাসমোদীর ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ!

আমরা আপনাদেরকে সিএসআইডির সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি সংলাপ ও জাতীয় ঐক্যের পথ ধরে সফলভাবে তিউনিসিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে। এই মুহূর্তে তিউনিসিয়া এক ঐতিহাসিক পরীক্ষার মুখোমুখি। এই পরীক্ষার ফলাফল শুধু আমাদের দেশেরই ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, আরববিশ্বের ভাগ্যও নির্ধারণ করবে। এ জন্যে সবার দৃষ্টি এখন তিউনিসিয়ার দিকে। আমি সম্প্রতি জর্ডান, মিশর ও আলজেরিয়া সফর করেছি। বিশ্বাস

করুন, বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে তারা সবাই তিউনিসিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আরব বসন্তের মাধ্যমে তিউনিসিয়া ইতোমধ্যে মুক্তি ও মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য আরবদেশগুলো তিউনিসিয়াকে অনুসরণ করছে। তারা আমাদের কাছে অনেক কিছুই আশা করছে। আত্মমর্যাদা, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও আরব-ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক তিউনিসিয়ায় উত্তরণে সবাই প্রতীক্ষা করছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সাথে সেকুলারিজমের সম্পর্ক খুবই জটিল। একই সাথে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও বটে। আমরা একটি নতুন গঠনতন্ত্র ও সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাচ্ছি। এটি হবে এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে বলে আমরা আশা করছি। ঠিক এমনই একটা সময়ে আমরা বিষয়টির সম্মুখীন হয়েছি।

আন-নাহদার প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রশিদ ঘানুশীকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। তারপরও স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বলছি – তিনি ‘দ্য মুভমেন্ট অব ইসলামিক টেনডেন্সি’র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এটিই পরবর্তীতে আন-নাহদা মুভমেন্ট এবং বিপ্লবের আগে আন-নাহদা পার্টি হিসেবে পরিচিত হয়। এখন পর্যন্ত ঘানুশীই এর প্রধান নেতা। তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদও বটে। আরব বিশ্বসহ পুরো বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে শীর্ষ চিন্তাবিদ হিসেবেও তিনি পরিচিত। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও এগুলোর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে তিনি ব্যাপক লেখালেখি করেছেন।

গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থানের কারণে ঘানুশীকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া, তিনি এখন এই দেশেই আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে। অথচ যিনি তাঁকে দণ্ড দিয়েছিলেন, তিনিই এখন নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

ঘানুশীর	কিছু	উল্লেখযোগ্য	কাজ	হলো	–
1)	Our	Way	to	Civilization,	
2)	Us	and	the	West,	
3)	The	Right	to	Differ	and
4)	The	Palestinian	Issue	at	a
5)	Women	Between	the	Quran	and
6)	From	the	Islamic	Thought	in
7)	Public	Freedoms	in	the	Islamic
8)	Predestination	in	Ibn	Taymiyya's	Thought,
9)	Contemplations	on	secularism	and	Civil
					Society,

- 10) The Islamist Movements and Points of Change,
- 11) From the Experience of the Islamist Movement in Tunisia, and
- 12) A Rebellion of Silence.

আশা করি, তাঁর ব্যাপারে এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই যথেষ্ট। অধ্যাপক রশিদ ঘানুশী, আপনাকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রশিদ ঘানুশীর বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবী ও উম্মতের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, ভাই ও বোনেরা- আসসালামু আলাইকুম।

তিউনিসিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও বিদেশী অতিথিদের সামনে এই সন্ধ্যায় আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি সিএসআইডিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদেরকে জ্ঞান দিতে এখানে আসিনি। আজকের নির্ধারিত বিষয়ে নতুন করে বলার মতো কিছু নেই। তবুও একটি সাধারণ ঐক্যমত্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আরেকটু যাচাই করে নিতে পারি। এটি হয়তো আমাদের নেতৃবৃন্দকে সার্বজনীন ঐক্যমত্য, কিংবা অন্ততপক্ষে কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো ঐক্যমত্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামের সাথে সেক্যুলারিজমের সম্পর্ক। এক দৃষ্টিতে বিষয়টি বেশ জটিল। এই সম্পর্ক কি দ্বন্দ্ব ও অনৈক্যের? নাকি সম্প্রীতি ও সাযুজ্যতার? প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আরো কিছু প্রশ্ন এসে যায়। যেমন: সরকারব্যবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী? ইসলাম ও আইনের মধ্যকার সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নগুলো তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার।

সেক্যুলারিজম ও ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময় মনে হতে পারে- তুলনামূলকভাবে সহজ ও স্পষ্ট কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি। অথচ এ বিষয়গুলো নিয়ে লোকজনের মাঝে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে, রয়েছে নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। তারমানে হলো, সেক্যুলারিজমের শুধু একটি ধরনই রয়েছে, তা নয়; বরং এর নানা ধরন রয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কে, কোন উদ্দেশ্যে, কী প্রস্তাব করছে- এর ভিত্তিতে ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

সেক্যুলারিজমের উৎপত্তি

সাদামাটাভাবে মনে করা হয়- সেক্যুলারিজম একটি দর্শন এবং আদর্শবাদী ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি মোকাবেলার ক্ষেত্রে একটি দার্শনিক চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়। ইউরোপে সৃষ্ট নানা

ধরনের সমস্যার একটি নিয়মতান্ত্রিক সমাধান হিসেবে পাশ্চাত্যে সেক্যুলারিজম হাজির হয়। ক্রমান্বয়ে এর বিবর্তন ও রূপায়ন ঘটে। নিছক দর্শন বা অধিবিদ্যাগত ব্যাপার হিসেবে এর উদ্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর অধিকাংশ সৃষ্ট হয়েছে প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরা আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য খর্ব হয়ে যায়। ১৬-১৭ শতকে ইউরোপের সংঘটিত ধর্মযুদ্ধগুলোও এই সমস্যার অন্যতম কারণ। এরই প্রেক্ষাপটে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব ঘটে।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন হলো- যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেক্যুলারিজমের সূচনা হয়েছে, আমাদের এখানে কি সেসব পর্যায় এসেছে? এই সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিলো রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ। যেমন: ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা এবং মানুষের বিবেচনাবোধের ওপর হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত থাকা। এর ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা সামাজিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হয়েছে এবং ধর্মের পরিধি ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমিত থেকেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক জীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ সুস্পষ্ট। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ সত্ত্বেও সেখানে ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তৃতায় উল্লেখযোগ্য হারে ধর্মকে ব্যবহার করেন। তাদের সকল নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্ম একটি আলোচিত বিষয়। স্কুলে প্রার্থনা করা এবং গর্ভপাতের অধিকারের মতো বিষয়গুলো নিয়ে প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব বক্তব্য থাকে।

সেখানকার এই বাস্তবতার পেছনে একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ইভানজ্যেলিক খ্রিষ্টানদের দ্বারা। তারা ইউরোপের ক্যাথলিক চার্চের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে স্থায়ী ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে এসেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা ‘প্রমিজড ল্যান্ড’ তথা ‘প্রতিশ্রুত ভূমি’ হিসেবে বিবেচনা করেছিলো। তাদের মতে, এই স্বপ্নভূমির কথা তাওরাত ও গসপেলে বর্ণিত রয়েছে।

ফ্রান্সে-আমেরিকান চিন্তক টকুইভেল একবার মন্তব্য করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দল হচ্ছে চার্চ। সেখানে চার্চ যে রকম ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে, ইউরোপে তা দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে চার্চে প্রার্থনাকারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও ইউরোপে তা ৫ শতাংশেরও কম।

ইউরোপে ধর্মের ভূমিকা

ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটেও ধর্মের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এখানে ফ্রেঞ্চ ও অ্যাংলো-স্যাক্সন নামে দুইটি ধারা বিদ্যমান। অ্যাংলো-স্যাক্সন ধারায় ব্রিটিশ রানী পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরনের শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে, ফ্রান্সে ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ পৃথক। চার্চ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবীদের মধ্যে সংঘাতের যে ইতিহাস ফ্রান্সের রয়েছে, তার পরিণতি হিসেবে এই পৃথকীকরণ ঘটেছে। তাহলে ইউরোপেও আমরা সেকুলারিজমের একক ধরন দেখছি না। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা তো বটেই, এমনকি ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীরাও সেকুলারিজমের শুধু ফরাসী ভাষন দ্বারা প্রভাবিত। ফ্রেঞ্চ ব্যাখ্যা অনুসারে, জনপরিমণ্ডল থেকে ধর্ম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে। রাষ্ট্রই হবে জাতীয় পরিচয়ের একমাত্র শর্ত। জনপরিমণ্ডল থেকে ধর্ম ও এর প্রতীকগুলোকে বাদ দেয়ার এই মূলনীতির কারণে শুধু ফ্রান্সে হেডস্কার্ফ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশে এ ধরনের মূলনীতি না থাকায় সেসব দেশে হেডস্কার্ফ নিয়ে এ ধরনের কঠোর অবস্থান দেখা যায় না। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে শুধু ফ্রান্সেই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে এই বিশেষ অবস্থা তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে, আমরা সাধারণত সেকুলার ওয়ার্ল্ডভিউর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনটির দিকে দৃষ্টি দেই না। সেটি হলো রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত সেকুলার বোঝাপড়া। এর মানে, রাষ্ট্র হচ্ছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা সব ধরনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোনো দলের পক্ষ হয়ে কোনো বিষয়ে নাক গলাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার মতো ব্যাপার কি ইসলামে আছে?

ইসলাম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা

ইসলাম হচ্ছে রাজনীতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত ব্যবস্থা। মহানবী (সা.) ধর্মের সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মদীনা থেকে মক্কায় আগত যে দলটি প্রথমে আনুগত্যের শপথ (আকাবার প্রথম শপথ) করেছিলো, তা ছিলো আব্বাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) প্রতি ঈমানের ধর্মীয় শপথ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের শপথ (আকাবার দ্বিতীয় শপথ) ছিলো মদীনা আক্রান্ত হলে প্রয়োজনে তরবারী দিয়ে হলেও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা সংক্রান্ত। ইসলামপূর্ব সময়ে মদীনা পরিচিত ছিলো ইয়াসরিব হিসেবে। মোহাম্মদ (সা.) সেখানে হিজরত করার পর নাম পাণ্টে রাখা হয় মদীনা। এই পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মদীনা অর্থ শহর বা নগর। এই

নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে- ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়, বরং এটি একটা সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপার। ইসলাম মানুষকে যাযাবর জীবন থেকে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে। তাই নগরব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর যাযাবর জীবনে ফিরে যাওয়াকে নিতান্তই অনাকাজ্জিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই ইসলাম যেখানেই গেছে সেখানেই নগরের পত্তন হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে পুরনো নগরীটি আমাদের দেশে অবস্থিত, যেটি আরবরা গড়ে তুলেছে। ইসলাম যে একটি সভ্যতা নির্মাণকারী ধর্ম, মহানবী (সা.) কর্তৃক নগর প্রতিষ্ঠাই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ ধর্ম যুদ্ধরত গোত্রগুলোকে যাযাবর জীবন থেকে সভ্য হিসেবে উন্নীত করেছে এবং একটা রাষ্ট্রের অধীনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির প্রসঙ্গ

যেহেতু মহানবী (সা.) মসজিদে নামাজ পড়াতেন, তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ছিলেন ইমাম। আবার একই সাথে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক নেতা। তিনি লোকজনের বিরোধ মীমাংসা করতেন, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন এবং বিভিন্ন সন্ধি ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেন। মহানবী (সা.) মদীনায় এসে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি একটি সংবিধান উপস্থাপন করেন, যা ‘সহীফাহ’ নামে পরিচিত। আপনাদের কাছে এর উদাহরণ হলেন মোস্তফা।^[1] এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সংবিধান। অনেকগুলো চুক্তির সমন্বয়ে প্রণীত এই সংবিধানটি ছিলো মক্কার মুহাজির ও তাদের আশ্রয়দাতা মদীনার আনসারদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তি। পরবর্তীতে ইহুদী গোত্রগুলো এই সংবিধানের আওতায় আসে।

আনসার ও মুহাজিরদেরকে একটি জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিলো এবং ইহুদীদেরকে এ জাতিসত্তায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এ সংবিধানে দুই ধর্মীয় জাতিকে একটি একক রাজনৈতিক জাতিসত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে পরিচয় লাভ করে। এই সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম ও রাজনৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য, যা বর্তমানকালের ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ। মোহাম্মদ সালিম আল আওয়া এবং মোহাম্মদ ওমরের মতো খ্যাতনামা স্কলারগণ এই অভিমত দিয়েছেন।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো পৃথকভাবে এ সংবিধানে উল্লেখিত ছিলো। সেখানে বলা ছিলো, মুসলিমরা একটি ধর্মীয় জাতি (উম্মাহ) এবং ইহুদীরা আরেকটি ধর্মীয় জাতি। এই দুই পক্ষ ও পৌত্তলিকরা মিলে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জাতি হিসেবে গঠিত

হয়েছিলো। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা সর্বদা স্পষ্ট না থাকলেও মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা থেকে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এরই আলোকে বলা যায়, ধর্ম হলো ইবাদত ও আনুগত্য সংক্রান্ত ব্যাপার, আর রাজনীতি হলো যুক্তি ও বিবেচনাবোধের ব্যাপার। মহানবীর (সা.) কোনো বক্তব্য সাহাবীদের কাছে বোধগম্য না হলে তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী, নাকি নিছক তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। ওহী হলে তাঁরা মেনে নিতেন। আর মহানবীর (সা.) ব্যক্তিগত মতামত হলে প্রয়োজনবোধে ভিন্নমত পোষণ করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহানবী (সা.) কর্তৃক বিভিন্ন সময় গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সাহাবীরা একাধিকবার দ্বিমত পোষণ করেছেন।^[2]

একদিন মদীনায় কিছু লোক খেজুর গাছের পরাগায়ণের কাজ করছিলো। মহানবী (সা.) তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, “আমি এ কাজের কোনো সুফল দেখছি না।” লোকেরা এ কথা শুনে ওহী মনে করে পরাগায়ণের কাজ বন্ধ করে দিলো। ফলে সে বছর অন্যবারের তুলনায় ফলন কম হলো। তারপর তারা মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলো, কেন তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের জাগতিক ব্যাপারের লাভজনক ব্যাপারগুলো তোমরাই ভালো জানো।

ধর্মের প্রকৃত ভূমিকা

সুতরাং, কৃষি, শিল্প, সরকার পরিচালনার পদ্ধতির মতো বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক নির্দেশনা প্রদান ধর্মের কাজ নয়। কারণ, অভিজ্ঞতার আলোকে সত্য উপনীত হতে যুক্তিবোধই যথেষ্ট। ধর্মের ভূমিকা হলো মানুষের অস্তিত্ব, উৎপত্তি, গন্তব্য এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত গভীর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া। ধর্মের আরেকটা কাজ হলো কিছু মূল্যবোধ ও মূলনীতি প্রদান করা। এগুলো আমাদের চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদান করবে।

জনজীবন থেকে ধর্মকে বাদ দেওয়া অর্থে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের ধারণা কখনোই ইসলামে ছিলো না। এ পর্যন্ত মুসলমানদের জীবনে ইসলামের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুসলিম জনজীবন ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা দ্বারা উদ্ভূত। যদিও ধর্ম ও রাজনীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা সচেতন। ইসলামী স্কলারদের চিন্তাধারায়ও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। তারা মুয়ামালাত (ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য কাজ) এবং ইবাদতকে আলাদা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ইবাদত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ও প্রথাগতভাবে পালনের বিষয়। অর্থাৎ এখানে সত্যে পৌঁছার জন্যে যুক্তি যথেষ্ট নয়। আর সাধারণ কল্যাণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হলো মুয়ামালাত। ইমাম শাতিবী ও ইবনে আশুরের মতো মহান স্কলারগণ জোর দিয়ে বলেছেন, ইসলাম এসেছে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য। স্কলারগণ একমত হয়েছেন, সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন

ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাই সকল ঐশীগ্রহের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ধর্মীয় নির্দেশনা, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ ও মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত যুক্তিবোধের আলোকে এই ব্যাপারগুলো বাস্তবায়নযোগ্য। মুয়াম্মালাতের ব্যাপারগুলো প্রতিনিয়ত বিকশিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু আকীদা, মূল্যবোধ ও সদগুণ সবসময়ই অপরিবর্তনীয়।

ইসলামে বহুত্ববাদ ও চিন্তার স্বাধীনতার ধারণা

ইসলামের ইতিহাসে সবসময়ই রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম কোনো না কোনোভাবে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কোনো বিশেষ স্থান-কালের লোকেরা ইসলামী মূল্যবোধকে যেভাবে বুঝেছে, তার আলোকে রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও, নিছক ঐশী আইন-কানুন দ্বারা পরিচালিত হতো বলেই কোনো রাষ্ট্র ইসলামী হিসেবে গণ্য ছিলো না। বরং, সেখানে মানবীয় বিচার-বিবেচনাও কার্যকর ছিলো, যার সমালোচনা করা যেতো। রাষ্ট্র একটা পর্যায় পর্যন্ত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতো। রাষ্ট্র যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতো এবং একটা একক ব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতো – যেমনটা ঘটেছিলো আব্বাসীয় আমলে – তখনই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তো। বলে রাখা দরকার, একই ধর্মের নানা ধরনের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর উদ্ভিন্ন ছিলেন। তাঁর আশংকা ছিলো, রাষ্ট্রের উপরও এই বিভাজন প্রভাব ফেলতে পারে। তাই তিনি ইমাম মালেককে (রহ.) ডেকে আনলেন এবং সবকিছুর সমন্বয় করে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করার অনুরোধ করলেন। এর ফলে ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল মুয়াত্তা’ রচনা করেন। এতে খলীফা আল মনসুর খুবই খুশি হলেন। তিনি এটাকে সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক আইনে পরিণত করতে চাইলেন। এতে ইমাম মালেক (রহ.) আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি এ রকম কিছু না করার জন্যে খলিফাকে অনুরোধ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিলো– মহানবীর (সা.) সাহাবীরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং তাঁরা ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা লোকজনকে পরিস্থিতির আলোকে উপযুক্ত পন্থা বেছে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণেই আমরা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় একটা মাজহাব, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অন্য মাজহাব, আবার মিশরে আরেকটা মাজহাবের প্রাধান্য দেখি।

ধর্মীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খ্রিষ্টধর্মে চার্চই একমাত্র কর্তৃপক্ষ। ইসলামে এ ধরনের কর্তৃপক্ষ না থাকায় ব্যাখ্যাদান ও চিন্তার অর্থবহ স্বাধীনতা রয়েছে। এই স্বাধীনতার ফলে স্বভাবতই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। আইন প্রণয়ন ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এতে কোনো সমস্যা

নেই। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নির্বাচন ও গণতন্ত্রই হচ্ছে এখন পর্যন্ত অনুসরণীয় মানবজাতির জন্যে সর্বাধিক কার্যকর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিচিত্তার পরিবর্তে সামষ্টিক মতামত প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে, খ্রিষ্টধর্মের মতো ইসলামে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ‘চার্চ’ ও কোরআনের মুখপাত্র হিসেবে ‘পোপ’ না নেই। ফলে কোনো বিশেষ স্কলার, দল বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে সমগ্র জাতি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঐশী ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আব্বাসীয় খলীফা আল মামুন কোরআনের একটিমাত্র ব্যাখ্যা এবং আকীদা সংক্রান্ত মুতাজিলা দর্শনকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বিদ্রোহ করেন এবং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তিনি হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে জনমত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং আল মামুন শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হন।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

পাশ্চাত্যের সমস্যাগুলো আবর্তিত হচ্ছিলো ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের মুক্তিকে কেন্দ্র করে। এটি করতে গিয়ে তারা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছিলো। অন্যদিকে, আমাদের প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য বিষয় হলো- রাষ্ট্রের কবল থেকে ধর্মের মুক্তি এবং ধর্মের ওপর আধিপত্য করা থেকে রাষ্ট্রকে বিরত রাখা। এর পাশাপাশি ধর্মকে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বজায় রাখা, সকল মুসলমানের জন্য কোরআন পড়া এবং তাদের বুঝজ্ঞান অনুযায়ী কোরআন বুঝার সুযোগ রাখা আমাদের বিবেচনার বিষয়। বহুত্ববাদে কোনো সমস্যা নেই, এটা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মুসলমানদের প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। ইসলামে যে ‘শুরা’র (পরামর্শ) ধারণা রয়েছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমাদের ঐতিহ্যে চার্চের মতো কোনো একক ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান নেই। সম্ভবত আমাদের শিয়া ভাইয়েরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী। কিন্তু সুন্নিদের মাঝে দ্বিমত ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার মতো স্কলারদের কাউন্সিল বা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই আমাদের প্রচুর স্কলার ও বুদ্ধিজীবী দরকার, যারা মুক্ত পরিবেশে আমাদের ইস্যুগুলো নিয়ে বিতর্ক ও গবেষণা করবেন এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইনসভাকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন।

রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক

আমাদের দেশে সেকুলার ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। উভয় পক্ষই একে অপরকে চরমপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করছে। একটা পক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে ইসলাম সম্পর্কে তাদের বুঝজ্ঞানকে উপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি। আরেকটা পক্ষ রাষ্ট্র, শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্কৃতি থেকে ইসলামের প্রভাব উপড়ে ফেলতে আগ্রহী।

মুসলিম বিশ্বসহ পুরো বিশ্বে এখন একটা ধর্মীয় পুনর্জাগরণ চলছে। পোপ দ্বিতীয় জন পল যে কার্যক্রম শুরু করেছিলেন, সেই সূত্রে পূর্ব ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের অধিকতর ভূমিকা দৃশ্যমান হচ্ছে। পুতিনের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সাফল্যও লক্ষ্যনীয়। এমন এক সন্ধিক্ষণে সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে ধর্মের প্রভাবের বিরোধিতা করাটা অযৌক্তিক। তবে ইসলামকে চাপিয়ে দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এটা অভিজাতদের ধর্ম নয়, এটা গণমানুষের ধর্ম। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য নয়, বরং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা আছে বলেই ইসলামের এত অনুসারী এবং দীর্ঘসময় ধরে এটি টিকে আছে। রাষ্ট্র বরং প্রায়শ ধর্মের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি আগেও বলেছি, ইসলামপন্থী বা অন্যান্য ধারার সাথে যারা যুক্ত তাদের অনেকের মধ্যে রাষ্ট্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করে ধর্মকে একটা সামাজিক ব্যাপার হিসেবে রেখে দেওয়ার ব্যাপারে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন হলো— রাষ্ট্র কেন ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়? কেন মসজিদকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়?

রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল ব্যাপার। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ বলতে কী বুঝানো হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে এটা গ্রহণযোগ্য নাকি বর্জনীয়। ওহীর প্রত্যক্ষ বিষয় এবং প্রায়োগিক রাজনৈতিক বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যেভাবে বুঝতেন সেভাবে যদি বিবেচনা করা হয় – অর্থাৎ রাষ্ট্র হচ্ছে একটা মানবীয় ব্যাপার, আর ওহী হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত – তাহলে তা ঠিক আছে। আর যদি একে ফরাসী ধারণা কিংবা মার্ক্সীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে তা ভয়ানক বিপদজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই ব্যাখ্যা রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে রাষ্ট্র মাফিয়াচক্রে পরিণত হবে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে পড়বে লুণ্ঠনবাদী, রাজনীতি হয়ে পড়বে প্রতারণা ও ভণ্ডামিপূর্ণ। কিছু ইতিবাচক দিক ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে ঠিক এই ব্যাপারগুলোই ঘটেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অল্প কয়েকজন অর্থনৈতিক দালালের খপ্পড়ে বন্দি। এরা প্রচুর অর্থের মালিক, অসংখ্য মিডিয়া তাদের হাতে। এসবের মাধ্যমে তারা রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করে।

এই বিবেচনায় মানুষের জন্যে ধর্ম খুবই প্রয়োজনীয়। ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নির্দেশনার ফলে মানুষ ন্যায় ও অন্যায়ের (হালাল ও হারাম) মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।^[3] হালাল-হারাম নির্ধারণে একচ্ছত্র কর্তৃত্ববাদী চার্চের ধারণা যেহেতু ইসলামে নেই, তাই এসব সমস্যা অগ্রগণ্য চিন্তাবিদগণ, জনগণ ও মিডিয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে।

রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া এবং সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। অতএব, মানুষের মুক্তি ও অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম একটা ভারসাম্যপূর্ণ উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ধর্মই এই কাজটি করতে পারে। এই ভারসাম্য অর্জন করতে আমাদেরকে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হবে। ধর্মের কোনটা অপরিবর্তনীয়, আর কোনটা পরিবর্তনীয়— সেই মানদণ্ড ঠিক করতে হবে। আমাদের আইনপ্রণেতাদেরকে ধর্মের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ও প্রশিক্ষিত হতে হবে। এমন ব্যক্তিদের দ্বারা আইন প্রণয়নের সময় ধর্মীয় স্কলারদের মুখাপেক্ষী থাকার দরকার পড়ে না। একই কথা রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্মীয় ইবাদত পালনে বলপ্রয়োগের মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। রাষ্ট্রীয় পেশিশক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের মুনাফিকে পরিণত করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। মানুষকে স্বাধীন হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের বাহ্যিক কিছু দিককে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও তাদের অন্তরের অবস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসকে পরিবর্তন করা অসম্ভব।

হেডস্কার্ফ বা নেকাব হলো এক্ষেত্রে আমাদের সামনে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এর দুইটা মডেল রয়েছে। প্রথমটিতে নেকাব পরিধানের রাষ্ট্রীয় হুকুম তামিল করতে বাধ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে রাষ্ট্র নেকাবকে নিষিদ্ধ করেছে। একবার আমি একটি মুসলিম দেশের এয়ারপোর্টে সব নারীকেই বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। কিন্তু বিমানটি আকাশে উড়ার সাথে সাথে সব বোরকাও যেন উড়ে গেলো! এটা যে ওই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা, তা স্পষ্ট। জনগণের ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা সাধনে দেশটি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বেন আলীর শাসনামলে তিউনিসিয়ায় নারীদের নেকাব পরা নিষিদ্ধ ছিলো। নারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী পোশাক পরে জনসমক্ষে আসতে পারতো না। এখানেও রাষ্ট্র দমনপীড়ন চালিয়েছে এবং ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ধর্মের মূল ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি নয়, বরং ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আর রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সেবা তথা কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। মানুষের হৃদয়-মন নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। এ কারণে আমি জনগণের উপর সব ধরনের বলপ্রয়োগের বিরোধী। “ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই”- কোরআনের এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে আমি মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলা কিংবা ধর্মত্যাগ করার স্বাধীনতার পক্ষে।

কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর কোনো মানে নেই। প্রকাশ্যে বিশ্বাসী, আর অন্তরে অবিশ্বাসী- মুসলিম জাতির এ ধরনের মুনাফিকের দরকার নেই। স্বাধীনতা এমন এক মৌলিক বিষয়, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে পারে। অতএব, যিনি কালিমায়ে শাহাদাতের ঘোষণা দেন, স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতেই তিনি সেটি করেন। যার মূলে রয়েছে সচেতনতা এবং দৃঢ় বিশ্বাস।

মক্কার লোকেরা যখন মোহাম্মদকে (সা.) তাঁর ধর্মের ব্যাপারে আপত্তি জানালো, তখন তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতায় হস্তক্ষেপ না করতে তাদেরকে অনুরোধ করেন। তিনি লোকদের কাছে তাঁর বাণী প্রচারের স্বাধীনতা চাইলেন। মক্কার লোকেরা যদি তাঁকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতো, তাহলে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতেন না। তাঁর বাণী এতই শক্তিশালী ছিলো যে, তারা একে দমিয়ে রাখার জন্য বিকল্প কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। একমাত্র সত্য হওয়ার কারণে ইসলাম এতই শক্তিশালী যে, এর প্রতি আকৃষ্ট করতে মানুষের ওপর পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। যাবতীয় রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম ঘোষণা করে- “যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে প্রমাণ হাজির করো”।^[4]

শেষ কথা

আমাদের দেশে চলমান বিতর্কের অধিকাংশই সেকুলারিজম ও ইসলাম নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির কারণে হচ্ছে। আমরা বাস্তবে দেখিয়েছি— সেকুলারিজম কোনো নাস্তিক্যবাদী দর্শন নয়। বরং বিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এটা একটা প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা। আব্দুল ওয়াহহাব আল মাসিরি তাঁর গবেষণায় কটর সেকুলারিজম ও উদার সেকুলারিজমের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। কটর সেকুলারিজমের উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের ইতিহাস থেকে জ্যাকবীয় মডেলের কথা বলা যায়। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ চলছিলো, তখন জ্যাকবীয়দের প্রধান শ্লোগান ছিলো— “শেষ রাজাকে ফাঁসি দাও শেষ পাদ্রিটার দড়িতে” (strangle the last king with the entrails of the last priest)। এটা হচ্ছে ফ্রান্সের বাস্তবতা, যেটি সেকুলারিজমের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। ইসলাম নিয়েও এ ধরনের কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এ কারণে অনেকে মনে করে— ইসলাম শুধু মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে বিজয়ী হতে চায় এবং জোরপূর্বক নামাজ, রোজা ও নেকাবের মতো বিষয় চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে এগুলো অনেক দূরের ব্যাপার। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কপটতাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। কপট লোকদের জন্যে চিরস্থায়ী দোজখের আগুন রয়েছে বলে সাবধান করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে বিপ্লবের মাধ্যমে একটা স্বৈরাচারকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছি। এই বিপ্লব আমাদেরকে নাগরিক মূল্যবোধ মেনে চলার কথা বলে। এই দেশ নির্দিষ্ট কোনো দলের হবে না। বরং এই দেশ হবে ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্য যে কোনো বিবেচনার উর্ধ্বে সকল নাগরিকের। নাগরিকদের সমঅধিকার, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে যে কোনো কিছু করার স্বাধীনতা এবং নাগরিক প্রতিনিধিদের দ্বারা সংসদে প্রণীত আইন মেনে চলার অধিকার ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে।

সেকুলারিজমের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে এই হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আশা করি আমি মূল ব্যাপারটা বলতে পেরেছি। মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

রেফারেন্স ও নোট:

[1] এই বক্তব্যটি প্রদানকালে মোস্তফা বিন জাফর ছিলেন বিপ্লবোত্তর তিউনিসিয়ার নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যাশনাল কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্রেসিডেন্ট। তিনি এই সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত ছিলেন।

[2] মহানবীর (সা) ‘নবুয়তী মর্যাদা’ নিয়ে শায়খ তাহের বিন আশুর ব্যাপক কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণায় এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

[3] সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস নৈতিকতাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ ও স্থায়ী ভিত্তি প্রদান করে। নৈতিকতার জন্যে ধর্ম অপরিহার্য শর্ত না হলেও ধর্ম বহির্ভূত নৈতিকতার কোনো বস্তুগত ভিত্তি (objective reality) পাওয়া যায় না। - সম্পাদক

[4] সূরা বাকারা ২:১১১- (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইতিহাস পাঠ করে কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, পনের শতাব্দীর পূর্বে কোন কালেই এ মতবাদ দুনিয়ার প্রচলিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের লড়াই চিরন্তন। যখনই আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান মানব সমাজে কায়েম করার উদ্দেশ্যে নবী ও রাসূলগণ আওয়াজ তুলেছেন তখনই শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে নানা অজুহাতে প্রবল বিরোধিতা হয়েছে। ইব্রাহীম (আ) এর সময় নমরুদ ও মূসা (আ) এর সময় ফিরআউন কঠোরভাবে পূর্ণাঙ্গ ধর্মের বিরোধিতা করেছে। অথচ তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করত। ধর্মকে কোন সময়ই তারা অস্বীকার করেনি। নমরুদের দরাবরে রাজ পুরোহিত ছিল ইব্রাহীম (আ) এর পিতা আযর। আল্লাহকে ও ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিচালক শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে তারা কিছুতেই রাজী ছিলনা। সুতরাং আধুনিক পরিভাষায় তাদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই বলতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর যুগে আবু লাহাব এবং আবু জেহেল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই ছিল।

ইসলামি মহলে ধর্মনিরপেক্ষতা: আলেমরা যেভাবে দেখেন

বাংলাদেশের ইসলামি ঘরানায় ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা কমবেশি হচ্ছে। কেউ এই মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে, কেউ-বা একে ‘প্রকারান্তরে ইসলামি মতবাদ’ আখ্যা দিয়ে এর পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন এবং একে ঢালাওভাবে সমর্থন করছেন। আবার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সরাসরি এই মতবাদ সমর্থন না করলেও, মতবাদটির বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজ তাঁরা পালন করছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব রীতি-রেওয়াজকে ইসলামাইজেশনেরও চেষ্টা করছেন। তবে ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বরাবরই এই প্রবণতার বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হিসেবেই দেখে থাকেন। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের প্রচলিত ধারার ইসলামি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে অনেকটাই শিথিল। এই শিথিলতা থেকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকেও দূরে সরে যাচ্ছেন অনেকে। ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদে প্রভাবিত হয়ে ধর্ম ও মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করছে একটি গোষ্ঠী। গত কিছু দিন আগে জামায়াতের দলছুট একজন নেতা এ রকম একটি দল গঠনের নিজস্ব

প্রক্রিয়ার কথা জানিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য মহৎ থাকলেও তাঁর এই প্রক্রিয়াটা স্পষ্টতই ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা থেকে অনুপ্রাণিত, মন্তব্য বিশ্লেষকদের।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন কাজ, কর্মসূচি এবং মতবাদটির তৈরি সম্মানিত স্থানগুলো নিয়েও ইসলামি মহলের রাজনৈতিক ঘরানায় সবিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচি ও সম্মানিত স্থানকে ইসলামিকরণেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। গত একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটি ইসলামি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন প্রভাত ফেরিতে শহিদ মিনারে ফুল অর্পণের বদলে কুরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাদের নেতাকর্মীরা শহিদ মিনারের সামনে বসে প্রভাত ফেরিতে কুরআন তেলাওয়াত করে। এ ছাড়া শহিদ মিনারে একই সংগঠনের নেতাকর্মীদের জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের একটি ছবিও সেসময় ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছিল অনলাইনে। সমালোচকরা বলেন, ওই রাজনৈতিক দলের এসব কর্মসূচি মূলত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কার্যক্রমকে ইসলামিকরণের নামান্তর, যা মূলত একধরনের হীনমন্যতার পরিচায়ক।

ইসলামি মহলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রভাব এতোটাই বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসার একটি মাহফিলে ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন আলেম কসম খেয়ে বলেন, ধর্মহীনতার নীতি কুফরি মতবাদ, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কুফরি মতবাদ নয়, বরং এটাই ইসলামি মতবাদ।

তবে তাঁর এ বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন দেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম। এ ছাড়া বিজ্ঞ আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য, রচনা ও বয়ানে ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্কহীনতার কথা বারবার আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উচ্চতর ইসলামি আইন ও গবেষণা কেন্দ্র মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা'র মুদীর মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর এক বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা সমার্থবোধক। এবং এর সবচেয়ে হালকা ব্যাখ্যাদাতারও দাবি হল, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যা সুস্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী বক্তব্য। (ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান ও ইসলাম; মাসিক আল কাউসার, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিষয়ে একই বক্তব্য দেশের শীর্ষস্থানীয় মুফতী মাওলানা মিজানুর রহমান সাঈদেরও। এক আলাপচারিতায় তিনি ফাতেহ টুয়েন্টি ফোরকে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আলাদা একটি মতবাদ, ইসলামের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অনুরূপ এই মতবাদের কার্যক্রমের সঙ্গে ইসলামি রীতিনীতিকে সংশ্লিষ্ট করা উচিত হবে না।

শহিদ মিনারে ফুল অর্পণের বদলে কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজ আদায়কে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বৈধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় এ মুফতি বলেন, শহিদ বা মৃতব্যক্তির জন্য তাদের কবর জিয়ারতে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে সওয়াব রেসানি করা যায়, অথবা ঘরে বসেও করা যায়। এটা ইসলাম সমর্থিত। কিন্তু শহিদ মিনারে গিয়ে, যেখানে শহিদদের কোনো কবর নেই, সম্মান ও স্মরণের জন্য এম্মিতেই একটি স্তম্ভ বানিয়ে রাখা হয়েছে, ইসলামের সঙ্গে যার কোনো সাযুজ্য নেই, সেখানে গিয়ে আয়োজন করে শহিদদের স্মরণে কুরআন তেলাওয়াত, এটা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে আমার কাছে। কারণ, শহিদ মিনারে গিয়ে শহিদদের স্মরণ করার রেওয়াজ বিধর্মীদের কাছ থেকে এসেছে। আর বিধর্মীদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী আপত্তিজনক।

মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ আরও বলেন, শহিদ মিনারে ঘটা করে নামাজ আদায়ের ব্যাপারেও একই কথা। এটা বাড়াবাড়ি। শহিদদের স্মরণের জন্য আলাদা স্তম্ভ বা জায়গা নির্দিষ্ট করার রেওয়াজ ইসলামে নেই। একই সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট জায়গাকে নামাজ-কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামিককরণেরও কোনো জরুরত নাই।

ইসলামি মহলে সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষাবলম্বনকারী লোকজনের সংখ্যা অল্প থাকলেও, এই মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা কম নয় এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বলছেন ইসলাম বিষয়ক লেখক ও আলোচক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। ফাতেহ টুয়েন্টি ফোরের সঙ্গে বিশেষ এক আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চর্চা ব্যাপক হবার কারণে এই চর্চায় ইসলামি ঘরানার তরুণ শ্রেণি নিজেদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে শরিক হচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভালো যে দিকগুলো, সেগুলোকে তারা ইসলামাইজেশন করছেন, এবং এটাকেই ইসলাম হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। এই প্রবণতাটা দিন দিন কিন্তু বাড়ছে। বিশেষত তরুণ শ্রেণির মধ্যে।

তরুণ শ্রেণিকে এ থেকে ফেরাতে ইসলাম ও পুঁজিবাদী মতবাদগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও সংঘাত বিষয়ে ওলামায়ে কেরামকে আরও স্পষ্ট ও গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা ও বয়ান পেশ করা দরকার বলে মনে করেন মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, তরুণ শ্রেণির বড় একটি অংশের মধ্যে ইসলামের চর্চা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পাশ্চাত্য উদ্ভাবিত মতবাদগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্যের বেড়া জালে পড়ে তারা নানা ধরনের ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। ওলামায়ে কেরাম এসব চাকচিক্যের ফাঁদগুলো সম্পর্কে এই শ্রেণিকে আরও বেশি করে সচেতন করা সময়ের দাবি।

প্রয়াত ধর্মতত্ত্ববিদ ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ধর্মনিরপেক্ষতার বিশ্লেষণ করে বলেন, ‘ধর্ম

নিরপেক্ষতার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বৈষম্যহীন নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত ধর্মকে সব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ন্যায়বিচার, প্রশাসন, অর্থ ও রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধানগুলো বাতিল, অচল বা প্রয়োগ অযোগ্য বলে বিশ্বাস করা। প্রথম বিষয়টি ইসলাম নির্দেশিত ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি ও দ্বিতীয় বিষয়টি ইসলামি বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও কুফর।’ (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ)।

বিখ্যাত ইসলামি গবেষক ড. হামিদুল্লাহ দ্যা ইমারজেন্স অব ইসলাম গ্রন্থে বলেন, ব্যক্তি পর্যায়ে যে যেই ধর্মের হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সবার অধিকার সমান। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবে। সে জন্য ইসলামি রাষ্ট্রের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অমুসলিমদের ওপর ধর্মীয় হদ বা শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। অর্থাৎ ইসলামের শাস্তি আইন শুধু মুসলমানদের ওপর কার্যকর হবে।

কোনো অমুসলিমের ওপর ইসলামের শাস্তি আইন কার্যকর হবে না। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে ইসলামের আইন অমুসলিম নাগরিকের ওপর কখনোই চাপিয়ে দিতে পারে না।

অতএব, রাষ্ট্রঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কখনোই ইসলামবিরোধী নয়। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘ইউরোপীয়রা ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যা বুঝায় তা আমি মানি না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়’।

তৎকালীন ইউরোপের অবস্থা

যে ইউরোপ এর জন্মস্থান, সেখানকার তৎকালীন অবস্থার সঠিক ধারণা ব্যতীত ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাস বুঝা অসম্ভব। পনের শতাব্দীতে ইউরোপে সবেমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে। সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের হাতে নেতৃত্ব ছিল। আজকাল যেমন উচ্চ জ্ঞান লাভ করার জন্য আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট ধর্ণা দেই, চৌদ্দ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপবাসীদেরকেও তেমনি আলহামরা, কর্ডোভা ও গ্রানাডায় জ্ঞানের তালিশি ভীড় জমাতে হতো।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব যুগে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় মুসলিমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই মুসলিম সভ্যতার সৃষ্টি। পনের শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপ অজ্ঞতার অন্ধকারেই ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানের নিকট তাদের প্রথম হাতে খড়ি হয়। কিন্তু বারো শতাব্দীর পর থেকে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়।

কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব পুরুষের সাধনালব্ধ জ্ঞান সম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকে। অপরদিকে ইউরোপ যেটুকু জ্ঞানের আলো মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করেছিল তার ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান সাধনায় তারা ক্রমেই অগ্রসর হতে লাগল।

সে সময় ইউরোপে খ্রিস্টান পাদ্রীদের শাসন ছিল। পাদ্রীরা ধর্মের নামে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব করছিল। অথচ তাদের নিকট আল্লাহর বিশুদ্ধ বাণীর অস্তিত্ব নেই বলে ষষ্ঠ শতাব্দীতেই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। পাদ্রীরা খোদার নামে নিজেদের মত চালু করত। তারা মানুষের নিকট ধর্মের নামে নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবী করত এবং শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকায় তারা গায়ের জোরেই আনুগত্য করত। জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তারা সকল বিষয়েই নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিত।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের লড়াই

ইউরোপে যখন নতুন জ্ঞান সাধনার উন্মেষ হলো তখন পাদ্রীদের মনগড়া গবেষণাহীন মতামত গবেষকদের নিকট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল। সৃষ্টিজগতের রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হতে লাগল, পাদ্রীদের সাথে জ্ঞান সাধকদের মতবৈষম্য ততই প্রকট হয়ে উঠল। বিজ্ঞানীদের প্রত্যেকটি নতুন মত ক্ষমতাসীন পাদ্রীদের ভ্রান্তি প্রমাণ করে চলল। পাদ্রীগণ তখন অনন্যোপায় হয়ে ধর্মের দোহাই পাড়তে শুরু করল এবং শাসন শক্তি প্রয়োগ করে বেদ্রাঘাত থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত অমানুষিক শাস্তি দ্বারা গবেষকদের শায়েস্তা করতে লাগল। গ্যালিলিওর ন্যায় শত শত জ্ঞান পিপাসী পাদ্রীদের এ খোদায়ী অস্বীকার করার পাপে চরম দণ্ড ভোগ করল।

এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা হবার তাই হল। চিন্তা ও গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানের অনুসন্ধানীদের উপর এ যুলুমের বিরুদ্ধে সুধীমন্ডলী ও চিন্তাশীলদের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। পাদ্রীদের নিজস্ব মনগড়া মতামতের ভ্রান্তি যতই প্রমাণিত হল, ততই এ বিদ্রোহী শক্তি অধিকতর ময়বুত হয়ে চলল। ধর্মের নামে পাদ্রীদের এ অধার্মিক আচরণ বিদ্রোহীদের মনে তীব্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টি করল। তারা ধর্মকে মানুষের পক্ষে সকল প্রকার মঙ্গলের বিরোধী বলে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসল।

গীর্জা বনাম রাষ্ট্র

বিদ্রোহীরা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করল। পাদ্রীরা (গীর্জা) ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মাত্মক জনতার সহায়তায় রাজশক্তি নিয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। অন্যদিকে জীবনের সকল বিভাগ থেকে পাদ্রীদের উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিদ্রোহীরা অগ্রসর হল। দীর্ঘ দু'শ বছর (ষোল ও সতর শতাব্দী) ধরে এই ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। এ সংগ্রাম ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের' লড়াই নামে পরিচিত।

দীর্ঘ দু'শত বছরের অবিরাম সংগ্রামের দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, ধর্মবিশ্বাসকে গায়ের জোরে ধ্বংস করা যায় না। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাদের মনে যেমন জোর করে বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি বিশ্বাসীদেরকেও শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অবিশ্বাসীতে পরিণত করা যায় না। দু'পক্ষই বিব্রত হয়ে পড়ল। অতঃপর সংস্কারবাদীদের নেতৃত্বে দু'পক্ষের মধ্যে আপোষ প্রচেষ্টা জোরদার হয়ে উঠে।

উদ্ধৃতি

1. হেনরি লৌজিয়ের (২০১৩)। "ধর্মনিরপেক্ষতা"। গেরহার্ড বোয়েরিং, প্যাট্রিসিয়া ফ্রোন (সম্পাদনা)। দ্য প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলামিক পলিটিক্যাল থট। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস।
2. জন এল. এসপোসিতো, সম্পাদনা (২০১৪)। "ধর্মনিরপেক্ষতা"। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ইসলাম। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
3. জন এল. এসপোসিতো। ["ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার পুনর্বিবেচনা"](#) (পিডিএফ)। অ্যাসোসিয়েশন অফ রিলিজিয়ন ডেটা আর্কাইভস। পৃষ্ঠা ৩। ২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে [মূল](#) (পিডিএফ) থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০ এপ্রিল, ২০১৯।
4. নাদের হাশেমি (২০০৯)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা"](#)। জন এল. এসপোসিতো (সম্পাদনা)। দ্য অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড। অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। [ISBN 978-0-19-530513-5](#) এর [কীওয়ার্ড](#) (সাবস্ক্রিপশন প্রয়োজন)
5. আবদুল্লাহ সাঈদ (২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা এবং ইসলাম"](#)। ফিল জুকারম্যান; জন আর. শুক (সম্পাদক)। দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ সেকুলারিজম। পৃষ্ঠা

- ১৮৮। [doi : ১০.১০৯৩/অক্সফোর্ডএইচবি/৯৭৮০১৯৯৮৮৮৪৫৭.০১৩.১২](https://doi.org/10.1080/অক্সফোর্ডএইচবি/৯৭৮০১৯৯৮৮৮৪৫৭.০১৩.১২)। আইএস বিএন ৯৭৮-০-১৯-৯৯৮৮৪৫-৭.(সাবস্ক্রিপশন প্রয়োজন)
6. জন এল. এসপোসিটো। "ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার পুনর্বিবেচনা"(পিডিএফ)। অ্যাসোসিয়েশন অফ রিলিজিয়ন ডেটা আর্কাইভস। পৃষ্ঠা ১৩-১৫। ২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে মূল (পিডিএফ)। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০ এপ্রিল, ২০১৯।
 7. আবদুল্লাহ সাদ্দ (২০১৭)। "ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা এবং ইসলাম"। ফিল জুকারম্যান; জন আর. শুক (সম্পাদক)। দ্য অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অফ সেক্যুলারিজম। পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬। [doi : ১০.১০৯৩/অক্সফোর্ডএইচবি/৯৭৮০১৯৯৮৮৮৪৫৭.০১৩.১২](https://doi.org/10.1080/অক্সফোর্ডএইচবি/৯৭৮০১৯৯৮৮৮৪৫৭.০১৩.১২)। আইএসবিএন ৯৭৮-০-১৯-৯৯৮৮৪৫-৭.(সাবস্ক্রিপশন প্রয়োজন)
 8. বেল, জেফ্রি এম. (২০০৯-০৬-০১)। "ইসলামবাদ এবং সর্বগ্রাসীবাদ"। সর্বগ্রাসী আন্দোলন এবং রাজনৈতিক ধর্ম। ১০ (২): ৭৩-৯৬। [doi : ১০.১০৮০/১৪৬৯০৭৬০৯০৩৩৭১৩১৩](https://doi.org/10.1080/184609608030391313)। ISSN ১৪৬ ৯-০৭৬৪। S2CID ১৪৫৪০৫০১।
 9. অ্যাডামস, চার্লস জে. (১৯৮৩)। "মৌদুদী এবং ইসলামিক রাষ্ট্র"। এসপোসিটোতে, জন এল. (সম্পাদক)। পুনরুত্থিত ইসলামের কণ্ঠস্বর। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১১৩-৪। [মৌদুদী বিশ্বাস করতেন যে] যখন ধর্ম ব্যক্তিগত জগতে নিষ্কিণ্ত হয়, তখন মানুষ অনিবার্যভাবে তাদের পশুপ্রবৃত্তির কাছে চলে যায় এবং একে অপরের উপর মন্দ চাপিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, তারা নৈতিকতার বাধা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনা থেকে বাঁচতে চায় বলেই মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে।
 10. অ্যাডামস, চার্লস জে., "মাওদুদী এবং ইসলামিক রাষ্ট্র," জন এল. এসপোসিটো, সম্পাদনায়, পুনরুত্থিত ইসলামের কণ্ঠস্বর, (নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ১১৩
 11. ইরা এম. ল্যাপিডাস (অক্টোবর ১৯৭৫)। "প্রাথমিক ইসলামী সমাজের বিকাশে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ", ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিডল ইস্ট স্টাডিজ ৬ (৪), পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৮৫
 12. "ইসলাম: শরিয়াহের অধীনে শাসন"। বৈদেশিক সম্পর্ক কাউন্সিল। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে 2021-09-10।
 13. Kosmin, Barry A. "কঠোর ও নরম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং কঠোর ও নরম ধর্মনিরপেক্ষতা: একটি বৌদ্ধিক ও গবেষণামূলক চ্যালেঞ্জ।" (PDF) ২৭ মার্চ, ২০০৯ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা, ২০১১-০৩-২৪ তারিখে সংগৃহীত

14. আল ফারুকী, জাকির; সিদ্দিকী, মো. রোকনুজ্জামান (জুলাই ২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার"](#)। জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স, রাজশাহী কলেজ। ১(১): ২০। ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।
15. ডেভিস, লিন। ["ধর্ম ঝুঁকিপূর্ণ; ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করে"](#)। [ucl-ioe-press.com](#)। সংগৃহীত ১৯ নভেম্বর ২০২১।
16. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৮১।
17. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৮০-১।
18. আলম, মনসুর (জুলাই ২০১৩)। ["ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"](#)। পাকিস্তান হরাইজন। ৬৬(৩)। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি: ৩৭-৪৯ (পৃষ্ঠা ৩৮)। [জেএসটিওআর ২৪৭১১৫০২](#)।
19. আল ফারুকী, জাকির; সিদ্দিকী, মো. রোকনুজ্জামান (জুলাই ২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার"](#)। জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স, রাজশাহী কলেজ। ১(১): ২১-২। ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।
20. আল ফারুকী, জাকির; সিদ্দিকী, মো. রোকনুজ্জামান (জুলাই ২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার"](#)। জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স, রাজশাহী কলেজ। ১(১): ২৩-৪। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২৩ নভেম্বর ২০২১।
21. আলম, মনসুর (জুলাই ২০১৩)। ["ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"](#)। পাকিস্তান হরাইজন। ৬৬(৩)। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি: ৩৭-৪৯ (পৃষ্ঠা ১-২)। [JSTOR24711502](#)।
22. কিন, জন। "ধর্মনিরপেক্ষতার সীমা।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে, এম্পাসিটো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০। পৃষ্ঠা ৩৫।
23. বুস্তানি, বুটারাস ইবনে বুলুস। মুহিত আল-মুহিত: কামুস মুতাউয়াল আল-লুগাহ আল-আরাবিয়াহ/তালিফ বুটরুস আল-বুস্তানি। বৈরুত: মাকতাবাত লুবনান, ১৯৭৭।

24. অ্যাডমিন (2021-02-28)। ["Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar » tarihibilgi.org/](http://Laiklik ve Sekülerizm Kavramları Arasındaki Farklar » tarihibilgi.org/)["Sekülerizm" এবং "Laiklik" শব্দের মধ্যে পার্থক্য]। tarihibilgi.org (তুর্কি ভাষায়)। সংগৃহীত 2023-02-06।
25. আলম, মনসুর (জুলাই ২০১৩)। ["ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"](http://ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা)। পাকিস্তান হরাইজন। ৬৬(৩)। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি: ৩৭-৪৯ (পৃষ্ঠা ৩৯-৪০)। JSTOR28911502।
26. আলী, আশগার ই., (২০০০)। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ।
27. আল ফারুকী, জাকির; সিদ্দিকী, মো. রোকনুজ্জামান (জুলাই ২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার"](http://ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার)। জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স, রাজশাহী কলেজ। ১(১): ২৩। সংগৃহীত ২৩ নভেম্বর ২০২১।
28. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৩৫।
29. ইরা এম. ল্যাপিডাস (অক্টোবর ১৯৭৫)। "প্রাথমিক ইসলামী সমাজের বিকাশে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ", ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিডল ইস্ট স্টাডিজ ৬ (৪), পৃষ্ঠা ৩৬৩-৩৮৫ [৩৬৪-৫]
30. ইরা এম. ল্যাপিডাস। "প্রাথমিক ইসলামী সমাজের বিকাশে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ", ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিডল ইস্ট স্টাডিজ ৬ (৪) (অক্টোবর ১৯৭৫): 363-385। 366-370
31. আলী, মুসা। (২০১৫)। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা: ধারণা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং চ্যালেঞ্জ। এশিয়া প্যাসিফিক জার্নাল অফ রিসার্চ। I (XXIV), ১১৯-১২৪।
32. আল ফারুকী, জাকির; সিদ্দিকী, মো. রোকনুজ্জামান (জুলাই ২০১৭)। ["ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার"](http://ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুসলিম বিশ্ব: জুলাই ২০১৭ লেখকদের একটি সংক্ষিপ্তসার)। জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স, রাজশাহী কলেজ। ১(১): ১৬। ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সংগৃহীত।
33. রয়, অলিভিয়ার, রাজনৈতিক ইসলামের ব্যর্থতা অলিভিয়ার রয়, অনুবাদ করেছেন ক্যারল ভলক, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৪-১৫
34. ["উমাইয়া রাজবংশ / ইসলামিক ইতিহাস"](http://উমাইয়া রাজবংশ / ইসলামিক ইতিহাস)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে 2017-03-26।
35. ফৌজি এম. নাজ্জার (বসন্ত, ১৯৯৬)। মিশরে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বিতর্ক আর্কাইভ করা হয়েছে ২০১২-০৬-২৯ তারিখে archive.today, Arab Studies Quarterly (ASQ)।

36. তামিমি, আজাম। "আরব ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এসপোসিতো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। ১৩-২৮। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০। ১৭।
37. আদিক, নূরুল্লাহ। ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতি: বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে খিলাফত এবং মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিকীকরণ। নিউ ইয়র্ক: রাউটলেজ, ২০১২। ৮।
38. যেমন ফারিস নিমর এবং ইয়াকুব সররুফ, লেবাননের বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক যারা ১৮৮০-এর দশকে মিশরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সালামা মুসা, যিনি একজন কপটিক খ্রিস্টান মিশরীয় এবং ১৯২০ সালে মিশরীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা - ফৌজি নাজ্জার: ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বিতর্ক, আরব স্টাডিজ কোয়ার্টারলি; ১৯৯৬, খণ্ড ১৮ সংখ্যা ২
39. আবদুহ, মুহাম্মদ। "আল-ইদতিহাদ ফি আল-নাসরানিয়া ওয়া আল-ইসলাম।" ইন আল-আমাল আল-কামিলা লি আল-ইমাম মুহাম্মাদ 'আবদুহ। মুহাম্মদ 'আমারা দ্বারা সম্পাদিত। কায়রো: দার আল-শুরুক, 1993. 257-368।
40. হুরানি, অ্যালবার্ট। উদার যুগে আরবি চিন্তাধারা ১৭৯৮-১৯৩৯। কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩। ১৫৬।
41. তামিমি, আজাম। "আরব ধর্মনিরপেক্ষতার উৎপত্তি।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এসপোসিতো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। ১৩-২৮। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০।
42. টাউবার, এলিজার। "তিনটি পদ্ধতি, এক ধারণা: 'আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিব, নাজিব 'আজুরি এবং রশিদ রিদার চিন্তাধারায় ধর্ম এবং রাষ্ট্র।" ব্রিটিশ জার্নাল অফ মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ খণ্ড ২১। ১৯২।
43. তৌবার, এলিজার। "তিনটি পদ্ধতি, এক ধারণা: 'আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিব, নাজিব 'আজুরি এবং রশিদ রিদার চিন্তাধারায় ধর্ম এবং রাষ্ট্র।" ব্রিটিশ জার্নাল অফ মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ খণ্ড ২১। ১৯৬।
44. তৌবার, এলিজার। "তিনটি পদ্ধতি, এক ধারণা: 'আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকিব, নাজিব 'আজুরি এবং রশিদ রিদার চিন্তাধারায় ধর্ম এবং রাষ্ট্র।" ব্রিটিশ জার্নাল অফ মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ খণ্ড ২১। ১৯০-১৯৮।
45. আবদ আল-রাজিক, আলী। আল-ইসলাম ওয়া-উসুল আল-হুকম: বাহুত ফি আল-খিলাফাহ ওয়া-আল-হুকুমাহ ফি আল-ইসলাম। সুসাংদার আল-মাআরিফ লিল-তাইবা ওয়া-আল-নাশর, 1999?।

46. হুরানি, অ্যালবার্ট। উদার যুগে আরবি চিন্তাধারা ১৭৯৮-১৯৩৯। কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩। ১৮৩-১৮৮।
47. ব্ল্যাক, এ, "ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস", এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩১৬-৩১৯
48. হুরানি, অ্যালবার্ট। উদার যুগে আরবি চিন্তাধারা ১৭৯৮-১৯৩৯। কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৩। ৩৩০-৩৩২।
49. আলম, মনসুর (জুলাই ২০১৩)। "ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। পাকিস্তান হরাইজন। ৬৬ (৩)। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি: ৩৭-৪৯ (পৃষ্ঠা ৪৮)। জেএসটিওআর ২৪৭১১৫০২।
50. আল ইয়াফাই, ফয়সাল (২০১২-১১-০৩)। "আরব ধর্মনিরপেক্ষতার মৃত্যু"। দ্য ন্যাশনাল। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০২২-০৫-২৩।
51. শামি, খালদুন এইচ. (জুলাই ২০২২)। "মধ্যপ্রাচ্যের তথ্যচিত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা: চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রযোজনা, শিল্প চ্যালেঞ্জ, সীমাবদ্ধতা এবং সেন্সরশিপ"। UEA ডিজিটাল রিপোর্জিটরি। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০২৫-০৯-২০।
52. এসপোসিতো, জন এল. "একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এসপোসিতো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। ১-১২। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০.২।
53. এসপোসিতো, জন এল. "একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এসপোসিতো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। ১-১২। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০। ২।
54. "মুসলিম বিশ্ব: জরিপে দেখা গেছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা রাজনীতিতে ইসলাম চায়; হামাস, হিজবুল্লাহ সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতি" আর্কাইভ করা হয়েছে 2011-05-23 ওয়েব্যাক মেশিনে "এলএ টাইমস", 5 ডিসেম্বর, 2010।
55. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৭৯।
56. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৭৮।
57. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। ইসলাম এবং পশ্চিম। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৮৬।

58. এসপোসিতো, জন এল. "একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা।" মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এসপোসিতো, জন এল. এবং তামিমি, আজাম দ্বারা সম্পাদিত। ১-১২। নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০। ৩।
59. লুইস, বার্নার্ড (১৯৯৩)। *ইসলাম এবং পশ্চিম*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃষ্ঠা ১৮৪।
60. এসপোসিতো, জে, "দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইসলাম", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯
61. বনি, আর, "জিহাদ: কুরআন থেকে বিন লাদেন পর্যন্ত", পালথ্রেভ ম্যাকমিলান, হ্যাম্পশায়ার, ২০০৪, পৃ. ১৪৯
62. ফৌজি নাজ্জার, *ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বিতর্ক*, আরব স্টাডিজ ত্রৈমাসিক; ১৯৯৬, খণ্ড ১৮ সংখ্যা ২
63. নাভানি, টি, "দ্য ইসলামিক স্টেট", আল-খিলাফাহ পাবলিকেশন্স
64. আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার (২০০৬)। ["১৯. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"](#)। ইব্রাহিম আবু-রাবি' (সম্পাদনা)। দ্য ব্ল্যাকওয়েল কম্প্যানিয়ন টু কনটেম্পোরারি ইসলামিক থট। উইলি। পৃষ্ঠা ৩৩৮। [আইএসবিএন ৯৭৮১৪০৫১৭৮৪৮৮](#)। সংগৃহীত 19 নভেম্বর 2021.
65. ইব্রাহিম এম. আবু-রাবি, *সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারা*, পৃষ্ঠা ৩৩৮
66. মোহাম্মদ ইব্রাহিম মাবরুক, আল-আলমানিয়ুন (কায়রো, 1990), পৃ. 149।
67. আল-আহরাম, ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯
68. আলম, মনসুর (জুলাই ২০১৩)। ["ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা"](#)। পাকিস্তান হরাইজন। ৬৬ (৩)। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স: ৩৭-৪৯ (পৃষ্ঠা ৪৪)। [জেএসটিওআর ২৪৭১১৫০২](#)।
69. জাকারিয়া, এফ. ২০০৭, স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ: দেশে এবং বিদেশে উদার গণতন্ত্র। ডব্লিউ নর্টন অ্যান্ড কোং ইনকর্পোরেটেড, নিউ ইয়র্ক।
70. নর্টন, এআর (সম্পাদনা), ১৯৯৬। মধ্যপ্রাচ্যে নাগরিক সমাজ, দ্বিতীয় খণ্ড। ব্রিল, লিডেন
71. ["আলজেরিয়া ১৯৯১ সালের আইনসভা নির্বাচন"](#)। www.binghamton.edu। ৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে [মূল](#) থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৫ আগস্ট ২০১৮।
72. ["Türkiye Seçimleri"](#)। 16 আগস্ট 2018 এ [মূল](#) থেকে আর্কাইভ করা হয়েছে। সংগৃহীত 3 নভেম্বর 2014.

73. ইয়াভুজ, এমএইচ (২০০৬) একটি নতুন তুরস্কের উত্থান: গণতন্ত্র এবং আক পাটি।
উটাহ: উটাহ ইউনিভার্সিটি প্রেস
74. গ্যারন ২০০৩
75. নিকোলা প্র্যাট, আরব বিশ্বে গণতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদ, পৃষ্ঠা ১৩৭
76. ফরিদ জাকারিয়া কর্তৃক লিখিত ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা, নটন ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪৯
77. ফ্রেড হ্যালিডে, দুই ঘন্টা যা বিশ্ব কাঁপিয়ে দিয়েছিল।
78. নাদজে আল-আলী, ধর্মনিরপেক্ষতা লিঙ্গ এবং রাষ্ট্র, পৃষ্ঠা ১৪০
79. http://www.law.virginia.edu/html/news/2006_spr/jb_religion.htm
ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভ করা 2015-09-15: ২রা মার্চ, ২০০৬ ধর্মনিরপেক্ষতার
বিরোধপূর্ণ ধারণা মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের "আদর্শ" মেঘ
80. "আইসিএল - আলবেনিয়া - সংবিধান"। সংগৃহীত ১৮ মার্চ ২০১৫।
81. "সংবিধানের ৭.১ অনুচ্ছেদ" (পিডিএফ)। মূল (পিডিএফ) থেকে ২০১১-১০-২৬
তারিখে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০১৬-১০-২৯।
82. "আইসিএল - বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা - সংবিধান"। সংগৃহীত ১৮ মার্চ ২০১৫।
83. . ৯ অক্টোবর
২০০৬ [https://web.archive.org/web/20061009112408/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/Burkina%20FasoC%20\(englishsummary\)\(rev\).doc](https://web.archive.org/web/20061009112408/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/Burkina%20FasoC%20(englishsummary)(rev).doc) . ৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। ১৫
আগস্ট ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত। [cite web](#): অনুপস্থিত অথবা
খালি |title=(সাহায্য)
84. . ৯ অক্টোবর
২০০৬ [https://web.archive.org/web/20061009114533/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/ChadC%20\(english%20summary\)\(rev\).doc](https://web.archive.org/web/20061009114533/http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/constitutions/docs/ChadC%20(english%20summary)(rev).doc) . ৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। ১৫
আগস্ট ২০১৮ তারিখে সংগৃহীত। [cite web](#): অনুপস্থিত অথবা
খালি |title=(সাহায্য)
85. সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮, ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভ করা
হয়েছে
86. "ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ১৯৪৫ সালের সংবিধান"। ১০ মার্চ ২০০৭
তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২ অক্টোবর ২০০৬।

87. ["আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত ২০২২ সালের প্রতিবেদন: ইন্দোনেশিয়া"](#) ।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। ২০২২।
88. ["কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রের সংবিধান"](#) । মূল থেকে আর্কাইভ করা 2014-09-24
তারিখে । পুনরুদ্ধার করা হয়েছে 2014-11-24 ।
89. [কসোভো প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সংরক্ষণাগারভুক্ত](#) 2013-11-21 [ওয়েব্যাক মেশিনে](#) ,
কসোভো প্রজাতন্ত্রের সংবিধান,
90. ["সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১"](#) । ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখে [মূল](#) থেকে আর্কাইভ করা ।
91. ["সংবিধানের প্রস্তাবনা" \(PDF\)](#) । ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে [মূল \(PDF\)](#) থেকে
আর্কাইভ করা ।
92. জন এল. এসপোসিতো। দ্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ইসলাম। অক্সফোর্ড
ইউনিভার্সিটি প্রেস ইউএস, (২০০৪) [আইএসবিএন ০-১৯-৫১২৫৫৯-২](#) পৃষ্ঠা ২৩৩-
২৩৪
93. ["নাইজেরিয়ার সংবিধান"](#) । নাইজেরিয়ার আইন । ২৭ জুলাই ২০১১ তারিখে মূল
থেকে আর্কাইভ করা । পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ ।
94. ["উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কি প্রজাতন্ত্রের সংবিধান"](#) ।
95. নেলসন, ডিন (৫ জুন ২০১২)। ["পাকিস্তান জিন্নাহর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আহ্বানের
রেকর্ডিং চেয়েছে"](#) । দ্য টেলিগ্রাফ । সংগৃহীত ১৭ আগস্ট ২০২৫ ।
96. ["সেনেগাল"](#) । মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর । ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭। পুনরুদ্ধার করা
হয়েছে ১৮ মার্চ ২০১৫ ।
97. ["১৯৯১ সালের সিয়েরা লিওনের সংবিধান, ১৯৯৬ সালে পুনর্বহাল, ২০০৮ সাল পর্যন্ত
সংশোধনী সহ" \(PDF\)](#) ।
98. ["ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করে সুদান ৩০ বছরের ইসলামী আইনের অবসান
ঘটিয়েছে"](#) । গাঙ্ক নিউজ । ২০২০-০৯-০৬ । পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০২১-০৪-০৪ ।
99. ["তাজিকিস্তানের ১৯৯৪ সালের সংবিধান, ২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধনী
সহ" \(পিডিএফ\)](#) ।
100. ["সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২"](#) । ২০১০-১২-০১ তারিখে [মূল](#) থেকে আর্কাইভ করা
। ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত ।
101. ["তুর্কমেনিস্তানের সংবিধান"](#) । ১৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে [মূল](#) থেকে আর্কাইভ
করা । ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে সংগৃহীত ।
102. ["২০১১ সাল পর্যন্ত সংশোধনীসহ ১৯৯২ সালের উজবেকিস্তানের
সংবিধান" \(পিডিএফ\)](#) ।

103. [ক্রিমিয়ান গণপ্রজাতন্ত্রের সংবিধান আর্কাইভ করা হয়েছে](#) 2020-04-18 তারিখে [ওয়েব্যাক মেশিনে](#) রাশিয়ান ভাষায়
104. আলেভ সিনার, তুরস্কে আধুনিকতা, ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, পৃষ্ঠা ১৪
105. গুইন ডায়ার (৮ নভেম্বর ২০১৬)। ["এরদোগান তুরস্কের আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎকে লাইনচ্যুত করছেন"](#)। জাপান টাইমস।
106. মাইকেল রুবিন (৩ নভেম্বর ২০১৬)। ["তুরস্ক রক্তক্ষানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে"](#)। নিউজউইক।
107. আকিওল, মুস্তাফা (২২ জুলাই, ২০১৬)। ["তুরস্কে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার পিছনে কে ছিল?"](#)। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। নিউ ইয়র্ক টাইমস। ২৩ জুলাই ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।
108. সুকরু কুকুকসাহিন (২০ জুন ২০১৬)। ["শিক্ষার ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে তুর্কি শিক্ষার্থীরা উত্তাল"](#)। আল-মনিটর।
109. জুলফিকার দোগান (২৯ জুন ২০১৬)। ["তুরস্কের 'ধর্মপ্রাণ প্রজন্মের' জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন এরদোগান"](#)। আল-মনিটর।
110. কর্নেল, স্বাস্তে (২০১৫-১০-০৯)। ["দিয়ানেটের উত্থান: তুরস্কের ধর্মীয় বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজনীতিকরণ"](#)। turkeyanalyst.org। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০১৬-০৭-২৭।
111. মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র; http://www.islam-democracy.org/4th_Annual_Conference-shakman-Hurd_paper.asp [ওয়েব্যাক মেশিনে](#) ২০০৮-০২-২০ তারিখে আর্কাইভ করা হয়েছে
112. নাজিহ এন. আইয়ুবি, রাজনৈতিক ইসলাম: আরব বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১১৩
113. লরি এ. ব্র্যান্ড, নারী, রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক উদারীকরণ: মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার অভিজ্ঞতা, পৃষ্ঠা ১৭৮
114. [এলিজাবেথ শাকম্যান হার্ড](#) (১৬ মে, ২০০৩)। ["মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র"](#)। সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ইসলাম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি। ২০০৮-০২-২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৫ আগস্ট ২০১৮।
115. নাজিহ এন. আইয়ুবি, রাজনৈতিক ইসলাম: আরব বিশ্বে ধর্ম ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১১৪
116. <http://www.azeytouna.net> [ওয়েব্যাক মেশিন](#) [আজেইটোনা](#) ম্যাগাজিনে 2016-01-25 তারিখে আর্কাইভ করা হয়েছে

117. জন এল. এম্পোসিতো, দ্য ইসলামিক থ্রেট: মিথ নাকি বাস্তবতা?, পৃষ্ঠা ১৬৭
118. ["তিউনিসিয়া ইসলামপন্থী দল এল্লাহদাকে বৈধতা দিয়েছে"।](#)
119. খালাফ, রাউলা (২৭ এপ্রিল ২০১১)। ["তিউনিসিয়ার ইসলামপন্থীরা ভোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা চান"। ফিন্যান্সিয়াল টাইমস। FT.com। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২৪ জুন ২০১১।](#)
120. ["তিউনিসিয়ার নেতা নির্বাসন থেকে ফিরেছেন"। আল জাজিরা ইংরেজি। ২০ জানুয়ারী ২০১১। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২৪ জুন ২০১১।](#)
121. কামিনস্কি, ম্যাথিউ (২৬ অক্টোবর ২০১১)। ["ইসলামবাদী ডেমোক্র্যাটদের সাথে প্রচারণার পথে"। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সংগৃহীত।](#)
122. ISIE, নির্বাচনের জন্য উচ্চ ও স্বাধীন উদাহরণ। (২০১১), [জাতীয় গণপরিষদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে ২৩ নভেম্বর ২০১১ সালের ডিক্রি \(আরবি ভাষায়\), ২০১১-১১-১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।](#)
123. ফেল্ডম্যান, নোয়া (২০১১-১০-৩০)। ["তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থীদের বিজয় গণতন্ত্রের জয়: নোয়া ফেল্ডম্যান"। ব্লুমবার্গ। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০১১-১০-৩১।](#)
124. [তিউনিসিয়ার নতুন আল-নাহদা আর্কাইভ করা হয়েছে ২০১৩-১২-০৩ তারিখে](#) [ওয়েব্যাক মেশিনে](#) মার্ক লিঞ্চ ২৯ জুন ২০১১
125. বে, অস্টিন। ["তিউনিসিয়া এবং এর ইসলামপন্থীরা: বিপ্লব, দ্বিতীয় পর্যায়"। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০১২।](#)
126. টোটেন, মাইকেল। ["আমেরিকাকে না এবং র্যাডিক্যাল ইসলামকে না"। ২০১২-০৩-২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ২০১২-০৩-২২।](#)
127. ["মাহফুজের সমাধি, আরব উদারনীতির মৃত্যুশয্যা"। openDemocracy। ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৫ আগস্ট ২০১৮।](#)
128. ["মুক্ত প্রজাতন্ত্র। আগের দিন এবং পরে - ইসলামপন্থী জিন প্রথম তাণ্ডব চালিয়ে যাওয়ার ২৫ বছর হয়ে গেছে"। Fr.jpost.com। ২০১১-১২-২৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। ২০১২-০৪-২১ তারিখে সংগৃহীত।](#)
129. [ইসলামবাদ বিতর্ক: ঈশ্বরের প্রতिसংস্কৃতি সংরক্ষণাগারভুক্ত ২০০৮-০৪-০৩](#) [ওয়েব্যাক মেশিনে](#) সোনজা জেকরি, © Süddeutsche Zeitung / Qantara.de ২০০৮ জার্মান থেকে অনুবাদিত ফিলিস অ্যাভারসন

130. [মিশরীয় সংসদে ইসলামপন্থীরা ৭০% আসন জিতেছে। ওয়েব্যাক মেশিনে ২০২২-১০-০৪ তারিখে আর্কাইভ করা হয়েছে।](#) দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।
131. ["সিরিয়া"। ১১ জানুয়ারী ২০১২। ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা।](#) পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৫ আগস্ট ২০১৮।
132. ["সিরিয়া - ইসলাম"। countrystudies.us।](#) পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৫ আগস্ট ২০১৮।
133. হোমা ওমিদ, গণতন্ত্রের ধর্মতন্ত্র? ইরানে 'পশ্চিমবঙ্গীকরণ' এবং মৌলবাদের রাজনীতির সমালোচক: তৃতীয় বিশ্ব ত্রৈমাসিক; ডিসেম্বর ৯২, খণ্ড ১৩ সংখ্যা ৪
134. ফ্রেড হ্যালিডে, ইরান: একনায়কতন্ত্র এবং উন্নয়ন, পৃষ্ঠা ২৩